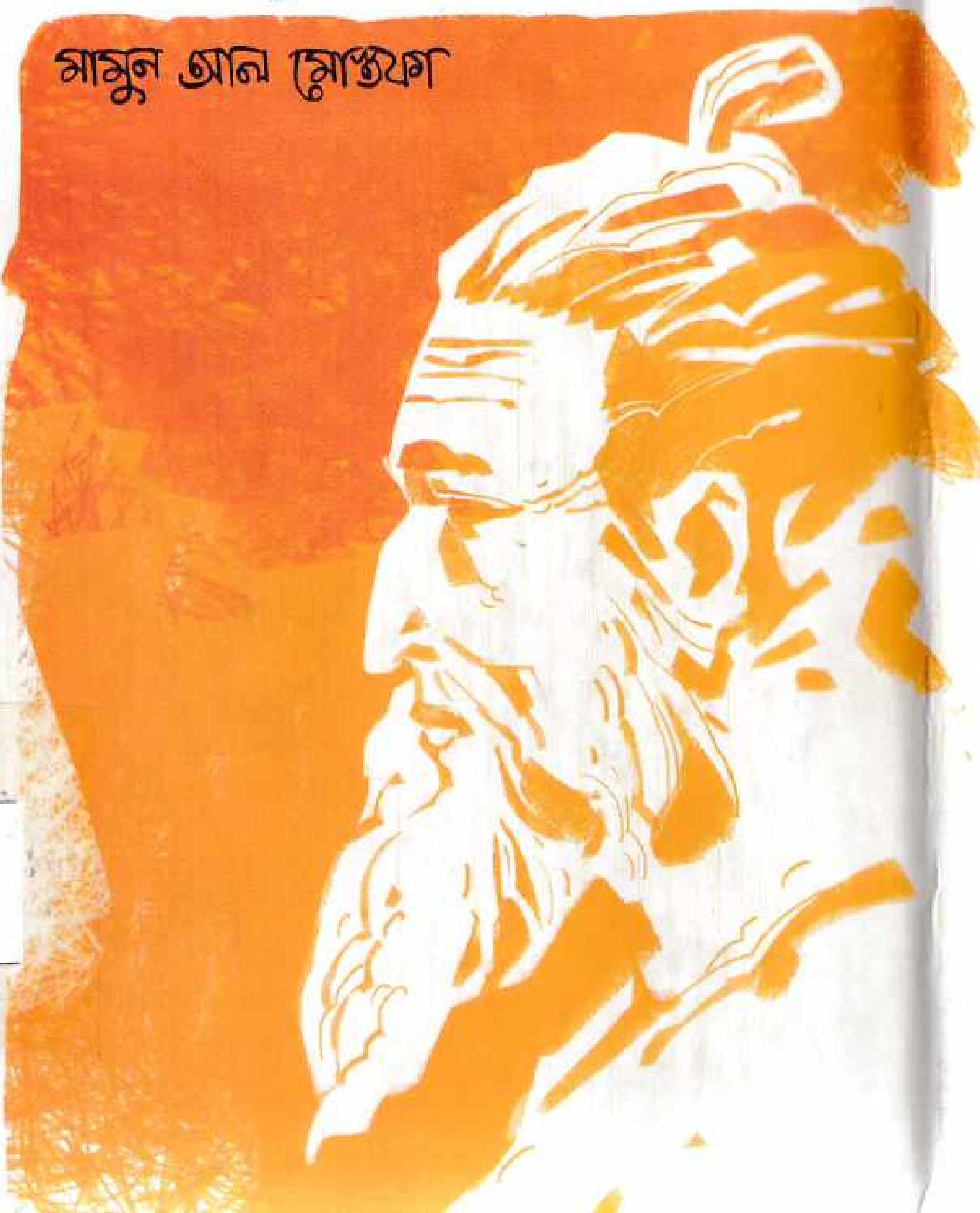
লালনের রাজনীতি

মামুন আল মোস্তফা



লালনের রাজনীতি • মামুন আল মোস্তফা

বাংলাদেশে লালন সাঁইকে সবাই চেনেন। চেনেন মরমি সাধক হিসেবে। এই সাধনার কিছু অংশ, অনেকেই জানেন, গোপন। এই গোপনীয়তার কি কোনো রাজনীতি আছে? কোনো সমাজতত্ত্ব আছে? সাধারণ মানুষের পক্ষে গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা লালনের বাণীর মর্ম অনুধাবন কি সম্ভব? লালনের বাণী কি একেবারেই অরাজনৈতিক, তাতে কোনো রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা নেই? আজকের দুনিয়া বৈষম্য ও সংঘাতপ্রবণ। বৈষম্য ও সংঘাত জাত-পাত, ধর্ম, লিঙ্গ ও পুঁজিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ও টিকে আছে। এই পরিস্থিতিতে বৈষম্যহীন ও ন্যায্য সমাজ গড়তে লালনের বাণী কি আমাদের জন্য কোনো নির্দেশনা হাজির করে? মোটকথা, এই সময়ের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় লালন কতটুকু প্রাসঙ্গিক? আর সমকালীন রাষ্ট্র-দর্শনের সঙ্গে লালনের চিন্তার মিল-অমিল কতটুকু? এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

লালনের রাজনীতি

মামুন আল মোস্তফা

প্রথমা

লালনের রাজনীতি

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮০০৮১

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

মুদ্রণ : ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩২০ টাকা

Laloner Rajniti
by Mamun Al Mostofa
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 320 only

ISBN 978 984 525 010 8

জগতের মায়েদের

কৃতজ্ঞতাপত্র

বাংলার মাঠে-ঘাটে-হাটে যুগ যুগ ধরে লালনের গান গীত হচ্ছে। তাঁর জীবন ও সাধনা, তাঁর গানের কাব্যগুণ, শিল্পগুণ ও অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে বিদ্যায়তনে গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। তবে রাজনীতি অধ্যয়ন যাঁদের পেশা, তাঁদের কাছে লালন কখনো আদরণীয় ছিলেন না। আমি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তাই লালনকে নিয়ে কেন লিখলাম সে ব্যাপারে একটু সাফাই, দেওয়া দরকার। লালনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। আমার বন্ধু মোহাম্মদ রোমেলের কল্যাণে। তখন আমি কেবলই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন 'ভালো ছাত্র' মাত্র। ভালো ছাত্র থেকে শিক্ষক হলাম।

শিক্ষক হিসেবে প্রায় এক দশক পার করার পর আমার বোধোদয় হলো : আমরা যা কিছু পড়ি বা পড়াই—সবই তো পশ্চিমের—হয় পশ্চিম ইউরোপ, না হয় পশ্চিম এশিয়ার। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কি নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক চিন্তা ছিল? থাকাই স্বাভাবিক। যদি থাকে, সেগুলোকে কোথায় পাওয়া যাবে? ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল। ভাবছিলাম, লালন যে পরম্পরাকে ধারণ করেন, সেখানে রাজনৈতিক চিন্তার কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না।

বইটির প্রতিটি অধ্যায় আলাদা আলাদাভাবে লেখা। যাঁরা নিজেদের বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, প্রথম অধ্যায়টি (লালনের রাজনৈতিক পাঠের ভূমিকা) আগে পড়বেন। তবে সাধারণ পাঠক যেকোনো অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করতে পারেন।

বইয়ের অধ্যায়গুলো প্রবন্ধ হিসেবে লেখা হয়েছিল। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখার আগে ও পরে আমি যারপরনাই রোমাঞ্চিত ছিলাম। লেখা শেষ করা মাত্রই আমার শিক্ষক অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদকে জোর করে পড়াতাম। তারপর পড়তে দিতাম আমার দুই ছাত্র মো. আরাফাত হোছাইন ও ফরহাদ নাইয়াকে।

মোহাম্মদ আজমকেও পড়িয়েছি। তাঁরা সবাই আমার অপাঠ্য ও অর্ধবোধ্য লেখাকে অন্যায্যভাবে প্রশংসার সাগরে ভাসিয়েছেন। বোধ করি, তাঁরা এটা করেছেন আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

যা-ই হোক, তাঁদের প্রশংসা আমাকে এই বই লেখার জন্য আক্ষরিক অর্থেই শক্তি জুগিয়েছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সব কটি প্রবন্ধ লেখা হয়ে যাওয়ার পর পুরোটা পড়তে দিলাম আমার শিক্ষক অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন ও অধ্যাপক হাকিম আরিফকে। তাঁরা বেশ কিছু বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলোকে আমলে নিয়ে পাণ্ডুলিপিতে কিছু পরিবর্তন এনেছি। বিভিন্ন পর্যায়ে আরও যাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মাসুদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক আহসান হাবীব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আইনুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহীদুল হাসান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম ও ড. তারিক মনজুর, সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইম রানা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারেক রেজা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দ্রাবিড় সৈকত, শ্রীনগর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কুদরত ই হুদা।

বইটি লেখা হয়েছে প্রায় এক বছর সময় ধরে। তবে যে কয় মাস আমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁদের ঘরসংসার ছেড়ে আমার ঢাকার বাসায় বন্দিজীবন কাটিয়েছেন এবং আমার দুটি ছানাকে দেখে রেখেছেন, সেই কয় মাসে এ লেখার প্রথম পাঠ তৈরি হয়েছে। বাকি সময়ে আমার সহায় ছিলেন দুজন—আমি হীনবল হলে তাঁরা সাহস জুগিয়েছেন, অতি সাহসী হয়ে উঠলে সতর্ক করেছেন; তাঁরা আমাকে আয়রোজগার বাড়ানোর চিন্তা থেকে দূরে রেখেছেন আর নিষ্কর্মা থাকার জন্য নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের একজন আমার স্ত্রী সায়মা ফারজানা, অপরজন আমার পিতা গোলাম মোস্তফা। প্রিয় পাঠক, এই গ্রন্থে তাঁদের অবদান অনেক।

মামুন আল মোস্তফা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
জানুয়ারি ২০১৯

সূচিপত্র

লালনের রাজনৈতিক পাঠের ভূমিকা

রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শনমাত্রই কি পশ্চিমা? আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করি, অর্থাৎ বাংলায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন কি একেবারেই অনুপস্থিত? বইপত্রে মোটা দাগে অনুপস্থিত, আমরা জানি। এই অনুপস্থিতি কি কোনোভাবে ইঙ্গিত করে যে রাজনীতির বয়ান বা তত্ত্বায়ন আমাদের ভূখণ্ডে কখনো ছিল না? না, সে ইঙ্গিত করে না। আমাদের বইপত্রে দেশজ রাজনৈতিক চিন্তা ও তত্ত্বায়নের অনুপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে সুদীর্ঘকালের বৈরী শাসন ও শোষণের কারণে এখানকার জ্ঞান অবদমিত হয়েছে এবং নিজেকে রক্ষার জন্য গোপনীয়তার খোলসে ঢুকে গেছে। যদি তা-ই হয়, সেই জ্ঞানকে আমরা কোথায় পাব? বাংলায় জ্ঞানচর্চার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। পদগুলো, বলা বাহুল্য, গীত হতো বলে চর্যাগীতি নামে খ্যাত। চর্যাগীতি থেকে বাউলগীতি-লালনগীতি-জালালগীতি—এই কয়েক হাজার বছরের পরিক্রমায় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বই লিখুক আর না-ই লিখুক, গান বেঁধেছে, গান গেয়েছে। তাদের শাস্ত্রপ্রীতি থাকুক আর না-ই থাকুক, আমরা দেখেছি তাদের গানপ্রীতি আছে। এ প্রীতি ঐতিহাসিক। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাদের এ প্রীতিকে দমন করতে পারেনি। ইসলাম প্রচারকারীদের একটি অংশ গীতিপ্রেমী বাঙালিকে গীতি বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছে বটে, কিন্তু বহু বছরের সহাবস্থানের কারণে বাংলার ইসলাম নিজেই গীতিময় হয়ে গেছে। আজকের দিনে গীতিবিহীন (গজল, হামদ, নাত ইত্যাদি নামে) কোনো ইসলামি অনুষ্ঠান পাওয়া কঠিন হবে। সেসব গীতির সুরের ক্ষেত্রেও তারা বেশ উদার (উৎসের বাছবিচার না করেই তারা বেশির ভাগ সুর গ্রহণ করে)। আর বাংলার হিন্দুর প্রার্থনা (কীর্তন) তো পুরোদস্তুর গীতি।

আমাদের ধারণা, বাংলার সামষ্টিক জীবনযাপনের সূত্র অনুসন্ধানের জন্য বঙ্গের গীতিভান্ডার আমাদের সাহায্য করতে পারে। সে কারণে আমাদের সামষ্টিক জীবনযাপনের আদি বোঝাপড়ার হদিসের জন্য গীতির আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আর গীতিনির্ভর এই সংস্কৃতির সাম্প্রতিক স্বাক্ষর লালনগীতি, জালালগীতি ইত্যাদি। এই ঘরানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ধারাটি লালনের। সে জন্য আমরা বঙ্গীয় সমাজের রাজনৈতিক সূত্রানুসন্ধানের জন্য লালনের কালামকে আশ্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

লালন বাংলার বাউলদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাউলেরাও তাঁকে 'আদিগুরু'র সম্মান দেন।[১] এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে লালন একটি পরম্পরার ফল। তিনি একটি পরম্পরাকে ধারণ ও লালন করেছেন। লালন ও তাঁর পরম্পরাকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে তাঁদের চর্চার মাধ্যমে। আর তাঁদের সেই চর্চার চিহ্ন সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত তাঁদের গানে বা কালামে। গান ব্যতীত বিধিবদ্ধভাবে তাঁদের বোঝার অন্য কোনো টেক্সট আমাদের কাছে নেই। মনে রাখা দরকার, তাঁদের কালাম বিনোদনের উপাদান নয়, সাধনার মাধ্যম। লালন ও তাঁর অনুসারীরা সাধনার অংশ হিসেবে সেগুলো রচনা ও সংরক্ষণ করেছেন।

বিদ্যায়তনে লালনচর্চা

লালনসহ অন্য বাউলদের পদ নিয়ে বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে আলোচনার সূত্রপাত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তিনি ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা করেন, সেটি পরে *মানুষের ধর্ম* নামে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লালনসহ অন্য বাউলদের 'নিরক্ষর', 'অশাস্ত্রজ্ঞ' এবং 'বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপন-হারা' হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁদের গানকে বলেছেন 'বিলাপগান'।[২] অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি বাউলদের কয়েকটি পদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বেদ-উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মর্মবাণীর সঙ্গে আনপড় বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন বাউলদের প্রচারিত ও গীত পদাবলির বার্তার মিল অনেক। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রায় এক যুগ পর ১৯৫৫ সালে বসন্তকুমার পাল রচনা করেন *মহাত্মা লালন ফকির*। রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের যে সারসংক্ষেপ হাজির করেছিলেন, বসন্তকুমার যেন তারই বিস্তারিত বিবরণ আমাদের সামনে হাজির করেন লালনকে অবলম্বন করে। তিনি লালনের সাম্যের ধারণা বা মানবতাবাদ, সহজিয়া আচার-অনুষ্ঠান,

মন-সংযত করার বিধান, সমর্পণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বসন্তকুমার দেখিয়েছেন, সনাতন ধর্মের আদিগ্রন্থ যেমন গীতা, ঋগ্‌বেদ ইত্যাদির মর্মবাণীকেই সংস্কারমুক্ত করে লালন তাঁর গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন।[৩] তারপর থেকে লালনের ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা হয়েছে অনেক। লালনের পদাবলির দেহতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়েও গবেষণা অনেক হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে সেগুলো রাবীন্দ্রিকই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের নির্যাসের সঙ্গে বাউলদের গানের অভেদ দেখিয়েছেন। আর বসন্তকুমার-পরবর্তী পণ্ডিতেরা সনাতন ধর্মের শাস্ত্রাদির সঙ্গে লালনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বাংলাদেশেও লালনচর্চা করতে গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন ও জসীমউদ্‌দীনের মতো পণ্ডিতেরা মানবতাবাদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলামের মর্মবাণীর সঙ্গে লালনের প্রচারিত গানের মর্মবাণীর অভেদ খুঁজে পেয়েছিলেন।[৪] সেই চর্চা এখনো অব্যাহতভাবে চলছে। আবদেল মাননান (২০০৭), আহমাদ মাযহার ও পারভেজ হোসেন (২০১৬), আবু ইসহাক হোসাইন (২০০৯) যা লিখেছেন, সেগুলোর মোদ্দাকথা হলো, লালনের কালামের যে অন্তর্নিহিত বার্তা ও তাৎপর্য, সেগুলো ইসলামেরই মৌল বাণী; যে সে ইসলাম নয়, একেবারে প্রগতিশীল ও আদি ইসলামের।[৫] শক্তিনাথ ঝা ও সুধীর চক্রবর্তী লালনসহ অন্য বাউলদের নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশুমার লিখেছেন। শক্তিনাথ বাউলদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি, তাঁদের ঐতিহ্য, সাধন-প্রণালি, সাহিত্য এমনকি দর্শন নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[৬] তিনি লিখেছেন, বাউল-ফকিরি পৈতৃক ধর্ম নয়; স্বেচ্ছায় বরণ করা ধর্ম। তবে তিনি এদের কেন গৌণ ধর্ম বা লোকধর্মের মোড়কে হাজির করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত লেখেননি। ধর্মের প্রচলিত সংজ্ঞায় এদেরকে ফেলা যাবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা, সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, বহু বাউল-সাধক রয়েছেন, যাঁরা বাহ্যত প্রচলিত হিন্দু বা মুসলিম সমাজের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন আবার একই সঙ্গে অন্যকে বাউল ধর্মের দীক্ষাও দিচ্ছেন।[৭] আসলে বাউলদের সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ধর্মের পরিসীমার মধ্যে ফেলা যাবে কি না, তা পরীক্ষা করা সুধীরের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজের ব্রাত্যজনদের সাধন পদ্ধতি আর দ্ব্যর্থক ভাষার গানের তথা দেহতত্ত্বের ভেদ বা রহস্য বোঝা এবং তা লিখে বোঝানো।[৮] সে উদ্দেশ্যে তিনি নৃবিজ্ঞানে ব্যবহৃত এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি অনুসরণ করে লালনসহ অন্য ঘরানার

বাউলদের সমাজ-সংসার-সাধনা-সংকটের সারাৎসার আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

জুন ম্যাকড্যানিয়েল ও চার্লস ক্যাপওয়েল উভয়েই মনে করেন, বাউলদের পথ হলো 'উল্টা' পথ।[৯] অর্থাৎ বাউল সম্প্রদায় সমাজের গ্রহণযোগ্য মতগুলোকে পুরোপুরি উল্টে ফেলে। ক্যাপওয়েল লেখেন, বাউলেরা উল্টো পথে এবং উল্টোভাবে চলেন; তাঁরা বিশ্বাস করেন যে এ পথ তাঁদের সত্য উদ্ঘাটনে ও জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।[১০] ক্ষিতিমোহন সেনকে উদ্ধৃত করে ক্যাপওয়েল লেখেন, বাউলতত্ত্বে স্বকীয়তা তেমন কিছুই নেই। এর উপাদানগুলো বেদ, উপনিষদ, জৈন ও বৌদ্ধ টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে। আর তাঁদের গানগুলো উত্তর ভারতে মধ্যযুগে রচিত কিছু কবিতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ক্যারল সলোমনের মত হলো, লালনের মধ্যে চার ধরনের দার্শনিক ও সাধনার উপাদানের উপস্থিতি : সহজিয়া বৌদ্ধ, তান্ত্রিক হিন্দুত্ব (বৈষ্ণব সহজিয়া এবং শিব-শাক্ত উভয়ই), গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ এবং ইসলাম।[১১] অতীশ দাশগুপ্তও মনে করেন যে বৈষ্ণব সহজিয়া, উত্তর ভারতের কবিতা ও সুফি ঘরানা থেকেই বাউলদের মত তৈরি।[১২] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে উদ্ধৃত করে জুন ম্যাকড্যানিয়েল বাউলদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন : (এক) তাঁরা প্রথাবহির্ভূত ও অবৈদিক। তাঁদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রচলিত ধর্ম, বিশেষ করে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা। (দুই) এদের ক্ষেত্রে গুরু বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। গুরু তাঁর অনুসারীদের মুক্তির পথ বাতলে দেন। (তিন) তাঁরা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অভেদ দেখেন। অর্থাৎ নিজের দেহকে গোটা মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করেন। একই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করেন যে খোদ ঈশ্বর মানবদেহে বর্তমান। (চার) দেবত্ব কেবল 'মনের মানুষ'-এর; বাউল সাধক চর্চার মাধ্যমে তাঁকে ধারণ বা আত্মস্থ করেন। (পাঁচ) রূপ ও স্বরূপ সাধনা। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের যুগল সাধনার মাধ্যমে তাঁরা রাধা ও কৃষ্ণের বা শিব ও শক্তির চিরায়ত সম্পর্ককে আস্বাদন করতে চান।[১৩]

চার্লস ক্যাপওয়েল বাউলদের বাংলার ভ্রাতৃত্বের কবি (Bards of Brotherhood) বলেছেন।[১৪] তাঁরা গানে বিভেদের নয়, বরং ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। মুচকুন্দ দুবে এবং অনির্বাণ মণ্ডল লালনকে পরমতসহিষ্ণু, প্রেমময় ও বর্ণ-গোত্র-ধর্মের ভেদহীন এক মানবতাবাদী সমাজের রূপকার হিসেবে হাজির করেছেন।[১৫] ক্যারল সলোমন আমাদের জানান : বাউলেরা জাতপাতবিরোধী; তাঁরা মুর্শিদ বা গুরু ভজনা করেন; দেহাত্মের চর্চা করেন;

আর বিশ্বাস করেন যে মানুষ মর্ত্যে পরমের প্রতিনিধি [পরমের উপস্থিতি মানুষের রজঃ ও বীর্যের মধ্যে]।[১৬] তবে লালনের নামে ভিত্তিহীন লেখাও হয়েছে। যেমন : ট্রিনা মামুন (২০০৮) লিখেছেন লালন ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন; বিলাতি ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন ইত্যাদি।[১৭] লালনের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নির্যাস আছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি কখনো ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন সে রকম কোনো ইঙ্গিত লালন-গবেষকেরা আজ পর্যন্ত আমাদের দেননি। আর লালন তো কোনোমতেই জাতীয়তাবাদী ছিলেন না; তিনি বরং মানুষের কোনো জাতিগত পরিচয়ের বেড়াজালে বন্দী হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি কখনো ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এমন তথ্যের এখনো সত্যতা মেলেনি।

অন্যদিকে বিদ্যায়তনিক বাউল-চর্চার বিষয়বস্তু-বিশ্লেষণ করেছেন ফেব্রিজিও ফেরারি (২০১২)। তাঁর মতে, বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে বাউল-সাধনার একধরনের শোধন করছে। এটা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী। এর কারণ খানিকটা ব্যবসায়িক। এই শোধনের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণি বাউল সাধনার যে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা ভাবমূর্তি ছিল, সেটি থেকেও তাদের সাধনাকে আলাদা করে দেখাতে সক্ষম হচ্ছে।[১৮] রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে হালের বুর্জোয়া—সকলে মিলে বাউলদের সম্পর্কে জনচৈতন্যে কিছুটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। বাউলদের সম্পর্কে পরিবর্তিত এই নতুন ধারণা গণমানুষের মধ্যে নব্য প্রভাবশালী শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের নিরিখে সচেতনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে (অন্য সব বিষয়ের মধ্যে) বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ও দার্শনিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে, অথবা কিছু বিষয়কে নতুন করে তৈরি করে, আবার নিজেদের জন্য অসুবিধাজনক বিষয়গুলোকে একেবারে মুছে দিয়ে।[১৯] বুদ্ধিজীবীরা যেকোনো দার্শনিক বা সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখবেন, সেটাই কাম্য। কিন্তু ফেরারির আপত্তি হলো : বাংলার বাউলেরা 'বর্তমানপন্থী' [স্মরণযোগ্য : 'সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে/ পাবি অমূল্য নিধি বর্তমানে'] এবং নিরন্তর অসমতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ক্রমাগত 'প্রতিরোধের' বয়ানকে জারি রাখেন; অথচ রবীন্দ্রপন্থীরা বাউলদের সম্পর্কে নিছক 'অনুমান'-এর ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজকে আরও বেশি নিজেদের মতো করে নির্মাণের লক্ষ্যে সুবিধাজনক বয়ান হাজির করেন।[২০]

এসব লেখায় যা প্রায় অনুপস্থিত, তা হলো তাঁদের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা রাজনীতি। এঁদের লেখা পড়ে ধারণা জন্মায়, লালনসহ অন্য বাউলেরা বুঝি রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতাকে সচেতনভাবে বর্জন করেছিলেন! লালন কি একেবারেই রাজনীতিবর্জিত বা এপলিটিক্যাল জীবন-যাপন করেছেন? চিন্তার দিক থেকেও কি তিনি ও তাঁর অনুসারীরা ক্ষমতার ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন?

বাউলদের চর্চা ও বয়ানে যে প্রতিরোধের উপস্থিতি ছিল, সে বিষয়ে আমরা কিছুটা ইঙ্গিত পাই সুধীর চক্রবর্তী, আনোয়ারুল করীম ও আবুল আহসান চৌধুরীর লেখায়। বাউলদের লোকধর্মের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করে সুধীর লেখেন, লোকধর্মের জন্মই তো প্রতিবাদ থেকে।[২১] লালনের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য হলো : লালনের প্রতিবাদটা খুব অন্য রকম। 'লালন সারা জীবন নিজের জাতের কথাটা তোলেননি, এর থেকে বড় প্রতিবাদ আর কী আছে?'[২২] আনোয়ারুল করীম লিখেছেন, 'সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ যারা ইতিমধ্যেই বর্ণবাদ এবং জাতিভেদের কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল, তারা বাউল এবং লালনের গানে নিজেদের বেঁচে থাকার একটি পাথেয় খুঁজে পেল'।[২৩] আর যেকোনো ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কিংবা নিজেদের বাঁচার অবলম্বন তৈরির তৎপরতার নামই হলো রাজনীতি। লালন যে বাস্তবিকভাবেই আজীবন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জারি রেখেছেন, সে বিষয়ে প্রথিতযশা লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন সবিস্তারে। লালনের প্রতিরোধের বিষয়ে তাঁর কিছু পর্যবেক্ষণ এখানে তুলে ধরা হলো :

> শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মের আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক ব্যাধি সৃষ্টি করেছিল, তার বিরুদ্ধে লালন সব সময়ই ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। (আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২, পৃ. ৬৩)
>
> আবহমান বাংলার সংস্কার ও শোষণের অচলায়তনের দুর্গে এমন শক্ত আঘাত এসেছে এক নিরক্ষর গ্রাম্য সাধকের নিকট থেকে— নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬)।

সংস্কার ও শোষণের বিরুদ্ধে লালনের প্রতিরোধের ভাষা সব সময় অহিংস ছিল না। কখনো কখনো তা ছিল সহিংস। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে : লালনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত কাঙাল হরিনাথ *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* প্রকাশ করতেন। এতে ধারাবাহিকভাবে শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ প্রকাশ করলে জমিদারপক্ষ তাঁর ওপর

অত্যন্ত রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিশোধস্পৃহ জমিদারপক্ষ কাঙালকে শায়েস্তা করার জন্য দেশীয় লাঠিয়াল ও পাঞ্জাবি গুন্ডা নিয়োগ করে। কাঙালের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি থেকে জানা যায়, জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করার জন্য বাউলসাধক লালন ফকির তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে টিট করে সুহৃদ কৃষকবন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন। অন্য সূত্রে আরও জানা যায়, দরিদ্র কৃষক ও প্রজাসাধারণের পাশাপাশি 'প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্য-সামন্তও কাঙালের অমূল্য জীবনরক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।'[২৪]

এটা স্পষ্ট, লালন একটি বৈরী সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী নিয়ে সামষ্টিক জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের এই যূথবদ্ধতা ছিল সকল প্রচলিত ও আধিপত্যশীল এবং একই সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার (কখনো পাশ কাটানো) জন্য। লালনের এই মোকাবিলা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়ান আমাদের এযাবৎকালের লালন-গবেষকদের দৃষ্টি মোটাদাগে এড়িয়ে গেছে। ফলে লালন আমাদের সামনে একেবারেই অরাজনৈতিকভাবে হাজির। প্রশ্ন জাগে, এতটা অরাজনৈতিকভাবে কি লালন ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের বাস্তব জীবনকে যাপন করেছেন? নাকি গবেষকেরা অরাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে পাঠ করেছেন বলে লালনের রাজনীতি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে? লালনের জীবনযাপন কি প্রকৃত প্রস্তাবে বিরাজনৈতিক ছিল? লালনের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর স্থানীয় কাগজ *হিতকরী*তে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম: 'মহাত্মা লালন ফকির'। সেখানে সম্পাদক উল্লেখ করেন যে তাঁর দশ হাজার অনুসারী ছিল।[২৫] এখন প্রশ্ন হলো: দশ হাজার অনুসারীকে নিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে কিছুটা মাত্রায় সামষ্টিক এবং সেহেতু সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়েছে। অনুসারীরা তাঁদের সামষ্টিক (কিংবা সাংগঠনিক) জীবন কোন কোন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত করবেন, সেসব বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে নির্দেশনা দিতে হয়েছে। আমরা যদি সেই নীতি বা সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে সেগুলো আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় পাথেয় হতে পারে। আর সে জন্যই লালনকে রাজনৈতিকভাবে পাঠ করা জরুরি।

প্রশ্ন আসতে পারে : লালনের রাজনৈতিক পাঠ কেন এত দিন যাবৎ হয়নি? অনুমান করি, লালন গবেষকরা লালন পদাবলির মরমি দিকগুলো নিয়ে এত বেশি আচ্ছন্ন ছিলেন যে রাজনৈতিক লালন পুরোপুরিভাবে তাঁদের চোখকে এড়িয়ে গেছেন। কেননা, মরমিবাদের মূল কথা হলো : বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগের বাইরে গিয়ে অতিপ্রাকৃত বা সুপারনরমাল কৌশল খাটানো। আর এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরমকে উপলব্ধি করতে পারেন।[২৬] অন্যদিকে, বোধ-বুদ্ধির সীমার মধ্যে যে বাস্তব দুনিয়া, সেখানে কে কখন কী পাবে, সেটার ফয়সালা হয় রাজনীতির মাধ্যমে। রাজনীতি মাত্রই সামষ্টিক। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমষ্টিকে নিয়ে চিন্তা ও বাস্তব তৎপরতার নাম রাজনীতি। অন্যদিকে মরমিবাদের অভীষ্ট নেহাতই 'বিশেষ অভিজ্ঞতা', যা একান্তই ব্যক্তিগত। ফলে মরমিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যেকোনো রাজনৈতিক বিষয়ই অরাজনৈতিক চেহারা নিয়ে হাজির হতে বাধ্য। কেননা, রাজনীতি যেখানে 'আপন' (we) ও 'পর' (they)-এর পার্থক্য নির্ণয় করে টিকে থাকে, মরমিবাদ সেখানে সকলের মধ্যে অভেদ খুঁজে বেড়ায়।

সন্দেহ নেই যে খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্তকুমার পাল থেকে শুরু করে হালের আবদেল মাননান পর্যন্ত অনেকেই লালনকে মরমি হিসেবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। আর লালনের অনেক কালামে মরমি উপাদানের উপস্থিতি যথেষ্ট। কিন্তু লালনকে রাজনৈতিকভাবে পাঠ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের দৃষ্টি তাঁর মরমিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; কেননা, মরমিবাদের শুরুই হয় আমাদের বোধ-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে। এর কারণ হলো, আমরা বাস্তবতাকে বুঝি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে বোধ-বুদ্ধি (রিজন) প্রয়োগ করে। কিন্তু যে বিষয় সব সময়ই অভিজ্ঞতার বাইরে থাকে, অর্থাৎ যিনি পরম, তাঁকে যদি পেতে বা অনুভব করতে হয়, তাহলে ইন্দ্রিয় যেমন অচল বা অপ্রাসঙ্গিক, ঠিক তেমনিভাবে পরমের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত বোধ-বুদ্ধিও অপ্রাসঙ্গিক। মরমিবাদ তাই 'পরম'কে আস্বাদন করার জন্য অভিজ্ঞতা ও বোধ-বুদ্ধি উভয়কেই অপ্রয়োগযোগ্য ও নিষ্ফল মনে করে। আর পরমকে আস্বাদনের লক্ষ্যেই মরমিবাদীরা বোধ-বুদ্ধিকে এড়িয়ে গিয়ে অতিপ্রাকৃত বা সুপারনরমাল কৌশল অবলম্বন করার কথা বলে। অন্যদিকে যা কিছু রাজনৈতিক, তার সবকিছুই আবশ্যিকভাবে বোধ-বুদ্ধির সীমার মধ্যে এবং

জাগতিকতার সীমার মধ্যে থাকতে হবে। লালনের কালাম বা বাণীতে যে চিন্তা প্রতিফলিত, সেখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে তিনি বোধ-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদী বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চে হয় নিত্যানন্দ/ যার অন্তরে সদা আনন্দ নিরানন্দ জানে না সে'।[২৭] অর্থাৎ জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান অর্জন করবেন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি উপায়ে আহরিত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে। অতীন্দ্রিয়ভাবে বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া কোনো পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ সম্ভব কি না, সে প্রশ্নের জবাবও লালনের কাছে আছে, 'অদেখা ভজনা করা/ আঁধার ঘরে সর্প ধরা'। দেখা যাচ্ছে যে লালন কঠোরভাবে দাবি করছেন: অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানলাভ করি। যদি তা-ই হয়, তাহলে ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মের দর্শন নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের ব্যাপারে লালনের কী বক্তব্য? লালনের স্পষ্ট জবাব: মানুষ যে রূপে নিরাকারকে (ঈশ্বর বা খোদাকে) বর্ণনা করে বা চিন্তা করে, তার পুরোটাই তার অভিজ্ঞতালব্ধ। সে জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত 'নিরাকার' প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে আকারসম্পন্ন মানুষের মতোই আচরণ করে। আসলে নিরাকারকে কখনোই জানা যাবে না। তিনি অজ্ঞেয় (unknowable)। লালনের স্পষ্ট কথা: মানুষের ভাষা তার অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়, সে জন্য নিরাকারকে বা অধরাকে কখনো ভাষায় প্রকাশও করা যাবে না, জানাও যাবে না। তিনি বলেন:

আল্লা হরি ভজন পূজন মানুষের সকল সৃজন
অনামক অচিনায় কখন জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে না সম্ভবে।
মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার সৃষ্টি এ জগতে
আচানক অধরকে চিনতে ভাষা বাক্যে নাহি পারে।

লালনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে না বললেও নদীয়া অঞ্চলের ভাবের চর্চা সম্পর্কে ফরহাদ মজহার কিছু মন্তব্য করেন, যেটা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা জরুরি। তিনি বলেন, 'পরম, অপর বা অধরা—যেভাবেই ধরি, তাঁর চরণে জীবের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই সাধকের জ্ঞান বা প্রজ্ঞার পরিচ্ছন্নতা অর্জন সম্ভবপর করে তোলার শর্ত। খেয়াল রাখতে হবে, সাধকের দিক থেকে 'জ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞা'র অর্থ পরম বা অধরাকে চিন্তা বা বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন নয়, বরং পরম বা অধরা যে স্বয়ং চিন্তা বা বুদ্ধি খাটানোর আগেই হাজির থাকে, সেই অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হওয়া, নিজের অস্তিত্বকে সেই দিকে ধাবিত করার চেষ্টা। নিজেকে খুলে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে সাধক বুদ্ধি বা চিন্তার সীমা

উপলব্ধি করে পরমের সঙ্গে জীবের সম্পর্কিত হওয়ার ইচ্ছা, সংকল্প, আবেগ বা এককথায় ভক্তির পরিচ্ছন্ন স্বভাব অর্জন করেন। সাধারণ অর্থে আমরা জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে যেভাবে বুঝি, সেইভাবে চর্চার ক্ষেত্রে সাধকের অবশ্যই একনিষ্ঠ হবার দরকার আছে, কিন্তু পরমের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার প্রশ্ন নিছকই পরম, অপর বা অধরাকে ইন্দ্রিয়োপলব্ধি বা বুদ্ধির 'বিষয়' হিসেবে পর্যবসিত করা নয়'।[২৮]

পরম বা অধরার প্রকৃতি কেমন হবে কিংবা তাকে কীভাবে জানা যাবে, সে বিষয়ে ফরহাদ মজহারের উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে আর যা-ই হোক, লালন একমত হবেন না। লালন আমাদের স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন, পরম বা অধরাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোঝা যাবে না। কারণ, পরমের বা অধরার প্রকৃত রূপ যা-ই হোক না কেন, তাঁর ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব। আর জ্ঞানের লক্ষ্যই হলো কোনো কিছুকে নিশ্চিত করা। তা ছাড়া মানুষ যে ভাষায় জ্ঞানচর্চা করে, সেই ভাষা 'পরম'কে বর্ণনা করতেও অক্ষম। সেদিক থেকে 'পরম'কে অজ্ঞেয় বলা যেতে পারে। অন্তত লালন তা-ই মনে করেন। সে জন্য তিনি বলেন, পরমের প্রকৃত রূপ যা-ই হোক, ব্যক্তি মানুষ নিজের মতো করে সেই রূপকে আস্বাদন করে। পরমের অনুভব একেক জনের একেক রকম। পরম সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে নিশ্চিত করে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই পরমের অভিজ্ঞতাকে লালন, আর যা-ই হোক, জ্ঞান বলতে নারাজ। লালন বলেন, 'ওই রূপ হেরি এই দর্পণে'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি যেরূপ দেখনা সেইরূপ দীন দয়াময়'। আবার 'আত্মারূপে সেই অধর'। আবার পরমের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্ভব কি না, সেটাও বিবেচ্য। পরম অধরা বলেই লালন গুরুকে পরমের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে গুরুতে সমর্পিত হওয়ার পরামর্শ দেন (দেখুন, অধ্যায় ৬)।

বাংলার ভাব বিষয়ে ফরহাদ মজহার আরও লেখেন, 'জীবরূপী মানুষ যে শর্তে জগতে "আছে" হয়ে থাকে, নিজেকে "আছি" দাবি করে এবং বিশ্বজগৎও তার কাছে "আছে" হয় বা অস্তিত্বমান হয়ে ধরা দেয়, সেই "আছে" বা "আছি" হওয়ার ঘটনা তার চেতনা, বুদ্ধি বা চিন্তার ফল নয়, বরং তার আগেই এই "আছে" বা "আছি" হওয়াটা ঘটে যায়।' তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্বজগতের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব-বাস্তবতা পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বাস্তবতা পর্যবেক্ষকের আগে থেকেই হাজির থাকে। লালন সম্পর্কে এ কথা বলে ফরহাদ মজহার তাঁকে

পরিষ্কারভাবেই পজিটিভিস্ট বা দৃষ্টবাদীদের শিবিরে ঠেলে দিয়েছেন। পজিটিভিস্টরা মনে করেন যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ; ব্যক্তি পর্যবেক্ষক হিসেবে হাজির থাকুক আর না থাকুক, বাস্তবতা তার নিজস্ব রূপে বিরাজ করবে এবং ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণে বাস্তবতায় কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না। আমরা দেখি, এখানে মজহার নিজের অজান্তেই বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে পজিটিভিজম আরোপ করেন। অনস্বীকার্য যে তাঁর কালামে দৃষ্টবাদের ছাপ স্পষ্টভাবে আছে [স্মর্তব্য, তিনি বলেন : শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চে হয় নিত্যানন্দ]। কিন্তু লালনের বাস্তবতার পাঠ অতটা সরল ছিল না। লালন বলেন, 'পড়শি যদি আমায় ছুঁতো/ যম যাতনা সবই যেত দূরে'। অর্থাৎ একজন সাধারণ ব্যক্তি যম-যাতনায় যতটা আক্রান্ত ও পীড়িত হবে, পড়শি যাঁকে ছুঁয়ে গেছেন তিনি (অর্থাৎ সাধু বা আত্মজ্ঞানী) ততটা হবেন না। অর্থাৎ সাধারণের বাস্তবতা ও তত্ত্বজ্ঞানীর বাস্তবতা এক নয়। সাধারণের বাস্তবতা আর জ্যান্তে মরার বাস্তবতা এক নয়। বাস্তবতা কি আগে থেকেই হাজির থাকে? নাকি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের রংও বদলায়? লালন কোনো ধরনের ভণিতা না করে সরাসরিই বলেন যে দর্পণের গুণ বা প্রকৃতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবতারও বদল হয়, 'আছে' ময়তারও পরিবর্তন হয়। আর সে জন্য কোনো কিছু আগে থেকেই 'আছে'হয়ে থাকে না। এখানে আমরা কনস্ট্রাকশনিস্ট বা গঠনবাদী লালনকে পাই। সুতরাং আমরা দেখি যে লালন মতাদর্শগতভাবে আমাদের কোথাও অনড় অবস্থানের কথা বলেন না। তেমনি জ্ঞান কীভাবে সম্ভব, সে বিষয়েও তিনি পজিটিভিস্ট বা কনস্ট্রাকশনিস্ট কোনো মেরুতেই অবস্থান করেন না। বরং তাঁর অবস্থানকে আমরা প্রায়োগিক (প্রাগমেটিক) বলতে পারি। জ্ঞান লাভের জন্য কোন পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী, সেটা দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানুষরূপী গুরু নির্ধারণ করবেন।

আবার মরমিবাদ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। লালনকে মরমি হিসেবে হাজির করাটা আধিপত্যশীল শ্রেণির স্বার্থ টিকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ লাভজনক। ফেব্রিজিও ফেরারি যুক্তি দেখান যে অধিপতি শ্রেণি তাদের স্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজে ফোকলোর ও মিস্টিসিজমকে টিকিয়ে রাখে। এটা টিকে থাকে সমাজের অধস্তন শ্রেণি (বা শ্রেণিসমূহের) ওপর আদর্শায়িত ও নাটকীয় আচার চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আর ফোকলোর বা মিস্টিসিজম (মরমিবাদ) ইত্যাদি নামে

চাপানোর ঘটনাটা ঘটে। বাংলার বাউলদের, ফেরারির ভাষায়, 'পাগলামি'কে সবার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধিজীবীরা বিজ্ঞাপিত করেছেন এবং হালে নিছক ব্যবসায়ের স্বার্থে তাঁদের বিজ্ঞাপন বাড়ছে। আর এর ফলে নতুন ধরনের পুঁজির উপযোগী অধ্যাত্মবাদ চর্চার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।[২৯] পুঁজির দাপুটে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোকপ্রিয় হওয়া বাউলদের নয়া আধ্যাত্মিকতার অসুবিধার দিকটা হলো এর মধ্যে 'আত্মজ্ঞান' অনুপস্থিত। লালনের কালামে 'আত্মজ্ঞান' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে; অথচ বুর্জোয়া বাউল হয় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, নয়তো সে জ্ঞানের ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে।

বাংলাদেশের লালনচর্চাও কি বুর্জোয়াময় হয়ে গেছে? ক্যারল সলোমনের মত হলো: বাংলাদেশে লালনকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। লালন একাডেমি, লালন একাডেমি পত্রিকা, লালন উৎসব, লালন সপ্তাহ ইত্যাদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার স্বাক্ষর। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো: লালনকে জাতীয়করণ করে, একজন 'নায়ক' বানিয়ে বাঙালি মুসলমানের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে এর মাধ্যমে লালনকে শুধু তাঁর 'চর্চা' থেকেই আলাদা করা হচ্ছে না, তিনি যে ফকিরি পন্থা নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সেই ফকিরদের থেকেও তাঁকে আলাদা করা হচ্ছে।[৩০] এ বিষয়ে তিনি একটি ঘটনা তুলে ধরেন: ১৯৮৬ সালে ক্যারল সলোমন বাংলাদেশে এসেছিলেন লালন বিষয়ে গবেষণার জন্য। তখন তিনি স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে লালনবিষয়ক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক পদস্থ ব্যক্তি এবং লালন-গবেষকও সেখানে ছিলেন। লালন সংগীত শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আশি-উর্ধ্ব কানাই শাহ হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, 'সবাই লালন আর তাঁর সাহিত্যমূল্য নিয়ে কথা বলে; আপনারা এই গানগুলো সারা জীবন ধরে শুনে এসেছেন। কিন্তু আমি লালন। আপনি লালন। আপনারা লালন। তিনি যেখানে জন্মেছিলেন, আমরা সকলে ঠিক সেখানেই জন্মেছি। আমরা ঠিক এক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু তাঁর চর্চার বিষয়ে কেউ জানে না।' তারপর তিনি একটি গান গেয়ে দেহ-চক্র বিষয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। তাঁর এই আলোচনায় উপস্থিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিল।[৩১] এই ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে লালন সম্পর্কে সমাজের বেশির ভাগ অংশের একধরনের 'আকর্ষণ' থাকলেও তাঁর 'চর্চা'সহ তাঁকে গ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। আবার কেউ দাবি করতে পারেন যে এর মাধ্যমে ফেরারির আশঙ্কাই যে সত্য, সেটা

বোঝা গেল। তবে এ ঘটনা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেটা হলো : বাঙালি মুসলমান সমাজ লালনের ব্যাপারে একমন নয়। তাঁর বিষয়ে সমাজে দোনোমনা ভাব আছে। একদিকে তাঁর মানবতাবাদী গান সবার মন কাড়ে, অন্যদিকে তাঁর চর্চার দিকটাকে আপত্তিকর মনে হয়।[৩২]

স্পষ্ট করে না বললেও ফরহাদ মজহার সম্ভবত এ ধরনের চিন্তা থেকেই লালনকে মরমি বলতে নারাজ।[৩৩] আনন্দ শঙ্কর রায়ের মতও ফরহাদ মজহারের অনুরূপ। তাঁর মত হলো বাউলদের গানে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত শব্দ ও আটপৌরে বাক্যশৈলী, রূপক ও ঠাট ফুটে ওঠে। আর সে জন্য এগুলোকে চট করে লোকে ফোক-সং বা লোকগীতি বলে বসে। কিন্তু এগুলো আসলে তাদের সাধন-সংগীত।[৩৪] লালনচর্চার বিষয়ে ক্যারল সলোমন ও জুন ক্যাপওয়েলের বক্তব্য আমরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি : লালনের তান্ত্রিক বিশ্বাস ও চর্চাকে না বুঝে লালনের গানকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না।[৩৫]

প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন আসে, লালনের বিশ্বাস ও চর্চাকে ধারণ না করে, লালন যেভাবে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে চেয়েছিলেন, সেটাকে বোঝা যাবে কি না। একই প্রশ্ন কি খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্মের গবেষকদের মোকাবিলা করতে হয়নি? হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন না করে কি বৌদ্ধের শিক্ষা ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব? বিদ্যায়তনগুলোতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়—এমন বৌদ্ধদর্শন বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাই প্রমাণ করবে যে সেটা সম্ভব। বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবৌদ্ধ পণ্ডিত শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

কেউ হয়তো আপত্তি করবেন, লালন ইচ্ছা, জ্ঞান ও কর্ম—এ তিনকে অদ্বৈত বলে বিবেচনা করেছেন। একই কথা তো ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামে অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং বাহ্যিক ক্রিয়া—এ তিনের অদ্বৈতর কথা বলা আছে। তাই বলে কি ইহুদি ধর্মাবলম্বী ইগনাজ গোল্ডজিহার, মন্টগোমেরি ওয়াট বা হালের ক্যারেন আর্মস্ট্রং ইসলাম বিষয়ে চর্চা করতে পারবেন না? একই কথা প্রযোজ্য ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেও। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম থেকে উদ্ভূত চেতনা কি স্ব স্ব ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না? আমরা দেখেছি যে পণ্ডিত মহলে তো বটেই, সাধারণ মহলেও এ ধরনের চর্চার স্বীকৃতি রয়েছে। তার মানে কখনো এই নয় যে লালনের বিশ্বাসকাঠামো ও চর্চাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার কথা

বলা হচ্ছে না। সেগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'চর্চাকারী ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ জ্ঞান নিষিদ্ধ'—এমন মানসিকতা আজকের দিনে অচল। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে লালন ও তাঁর অনুসারীরা তৎকালীন বিরূপ পরিবেশ ও বিদ্যমান শোষণ-বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগত কারণেই তাঁদের 'ঘরের' কিছু বিষয় 'পরের' কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সে জন্য গোপনীয়তা সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বলা দরকার।

গোপনীয়তার রাজনীতি

প্রথমেই শুরু করা যাক গোপনীয়তা কী? মনে হতে পারে, গোপনীয়তা বুঝি একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু গোপনীয়তা সংজ্ঞাগতভাবেই সামাজিক বিষয়। সমাজের বা সমষ্টির বাইরে গোপনীয়তার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি গোপন বিষয়েরই গোপন হওয়ার একটি ইতিহাস থাকে, থাকে রাজনীতিও। ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে কোনো প্রকাশ্য বিষয় গোপন হয়ে যেতে পারে, আবার একই কারণে কোনো গোপন বিষয়ও সহজ-স্বাভাবিক হিসেবে সবার কাছে প্রকাশযোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে জানে এবং যে জানে না—তাদের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্ককে নির্ধারণ করে এই গোপনীয়তা। তাই কোনো গোষ্ঠীর 'গোপন সাধনা' বিষয়ে জানতে হলে তার ঐতিহাসিক-আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করাটা জরুরি। বাংলার কর্তাভজা বাউলদের গোপন সাধনার বিষয়ে লিখতে গিয়ে হগ আরবান যুক্তি দেখান, যেকোনো 'গোপন সাধনা' বহুমাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে হাজির থাকে। বিরাজমান শোষণ-পীড়নকে পাশ কাটানোর লক্ষ্যে এই গোপন চর্চা ব্রাত্যজনদের জন্য নতুন বিকল্প সামাজিক স্তরায়ন প্রস্তাব করে। এই বিকল্প স্তরায়নের মাধ্যমেই আবার ব্রাত্যজনদের মধ্যে নতুন আধিপত্য ও নবতর প্রান্তিকতা তৈরি হয়। তখন ব্রাত্যজনদের মাঝে কেউ ক্ষমতায়িত হয়, কেউ হয় অধিকতর প্রান্তিক। ফলে এ গোপন চর্চার ফল অবিমিশ্র নয়।[৩৬]

আধিপত্যশীল জ্ঞানের তুলনায় ব্রাত্যজনদের জ্ঞান মর্যাদার দিক থেকে হীন। ব্রাত্যজনের জ্ঞান, মিশেল ফুকোর ভাষায়, সাবজুগেটেড নলেজ। এটি প্রায়শই আধিপত্যশীলদের বিবেচনায় ঊন-জ্ঞান। স্বাভাবিকভাবেই, এই ঊন-জ্ঞান আধিপত্যশীল জ্ঞানের সঙ্গে বিসদৃশ, আবার কখনো অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বৃহত্তর সমাজে ব্রাত্যজনদের এই ঊন-জ্ঞানকে ঠেকানোর কৌশল হলো

এদের ধারক-বাহকের সমালোচনা করা, এর প্রচার-প্রসারের ওপর একধরনের কলঙ্ক আরোপ করা, এগুলো ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত দমন-পীড়নের আশ্রয় নেওয়া। সে জন্য সমাজের দুর্বল অংশকে সব সময়ই সবলের চাপিয়ে দেওয়া আইনকানুন, রীতিনীতিকে স্বীকার করেই নিজের কথাটা বলতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে তার নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে এই অঞ্চলে ব্যতিক্রমহীন ও বিরামহীনভাবে সকল মত-পথের বাউলদের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে হাসি-মশকরা হয়েছে, তাদের নানা ধরনের অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সে জন্য সহজ কথা সহজে বলাটা আর হয় না, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে হয়। ফলে তৈরি হয় নতুন বয়ান, যার গূঢ় অর্থ কেবল একই অভিজ্ঞতার লোকেদের কাছেই পরিষ্কার থাকে। অন্যদের কাছে তা রয়ে যায় 'গোপন' বা বড়জোর দ্ব্যর্থবোধক।

আবার সমাজে যারা বহুমাত্রিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের শিকার, তারা কখনো কখনো বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে নতুন একধরনের ক্ষুদ্রতর বলয় তৈরি করে সেখানে অন্য সবার চেয়ে আলাদা হয়ে বাঁচতে চায়, আলাদা করে জীবনকে যাপন করতে চায়। ক্ষুদ্রতর বলয়ের মধ্যে কিছু 'গোপন জ্ঞানের অধিকারী' ব্যক্তি অন্য সব ক্ষমতাহীনের তুলনায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। এই জ্ঞান(ক্ষমতা)বানরা গোপন জ্ঞানকে পুঁজি করে নিজেদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বানিয়ে নিজস্ব স্বার্থকে অটুট রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। ফলে গোপন বিষয় গোপন থাকার প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরায়নের সঙ্গে নতুন ধরনের স্তরায়ন তৈরি করে। পিয়েরে বর্ডিওর তাত্ত্বিক কাঠামো ধার করে হগ আরবান যুক্তি দেখান যে বাউলদের গুহ্য সাধনা, যা বাইরের প্রচলিত সমাজের কাছে গোপন থাকে, কিছু ব্যক্তির প্রতীকী মূলধন বা সিম্বলিক ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করে; আর এর ফলে 'সাধু'র বিকল্প পথে ক্ষমতায়ন হয়। এই গোপন জ্ঞান সাধুর মান-ইজ্জত ও সর্বোপরি ক্ষমতার উৎস।

গোপনীয়তা প্রকাশের নৈতিক সংকট

যে বিষয় গোপন, সে বিষয়ে কোনো কিছু নিশ্চিত করে জানা কি সম্ভব? আর কোনোভাবে কেউ যদি সেটা জানতে পারে, তাহলে সে বিষয়টা সবার

জানার বা বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা কতটা নৈতিক?[৩৭] আরেকটি সংকট হলো : তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সদস্য ছাড়া অর্থাৎ 'ঘর'-এর লোক ছাড়া অন্য সংস্কৃতি থেকে আসা পর্যবেক্ষকের পক্ষে কিছু পরিমাণ 'বিকৃতি' ছাড়া বাউল/লালনচর্চার সবকিছু জানা কি সম্ভব হবে? এই বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে ক্যারল সলোমনের বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করবে, যেখানে একজন বাউল সাধক তাঁর চর্চার কথা সবার সামনে বলতে চান, কিন্তু সবার বাধার সামনে সেটা আর বলা হয় না। তা ছাড়া যখন বাউলেরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তখনই কি সেখানে 'পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের ফলে' কিঞ্চিৎ 'বিকৃতি' ঘটবে না? কারণ, আমরা জানি, গবেষকের উপস্থিতিই তার উপাত্ত বা গবেষণার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। এসব সংকট এড়ানোর লক্ষ্যে হগ আরবান আমাদের সমাজবিজ্ঞানী জর্জ সিমেলের পরামর্শ মেনে চলার পরামর্শ দেন। সিমেলের মত হলো, গোপনীয়তার বিষয়বস্তুর আলোচনার চেয়ে সমাজের মানুষেরা 'গোপন'কে কোন 'রূপ' এবং 'কৌশলে' গোপন রাখে, সেই আলোচনাই মূলত কার্যকর।

জর্জ সিমেল ও গোপনীয়তার সমাজতত্ত্ব

সিমেল বলেন, 'প্রকাশ্য সবকিছুই সাধারণ, সাদামাটা। আমজনতা এগুলোকে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে পাল্টাতেও পারে। এর বাইরেও কিছু বিষয় থাকে, যেগুলো অসাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলো থাকে বিশেষ কিছু লোকের হাতের নাগালে। সাধারণের দৃষ্টিসীমার আড়ালে। থাকে গোপন। আর গোপন মানেই অজানা। সবার ধারণা, যা কিছু গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ, সবই গোপন থাকে। এই গোপনীয়তা থেকে তৈরি হয় একটা বিভ্রান্তি। যা কিছু গোপন ও রহস্যাবৃত, তা-ই বুঝি গুরুত্বপূর্ণ—দরকারি। অজানার সামনে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কল্পনাশ্রয়ী হয়। অজানাকে মানুষ ভয়ও পায়। আর ভয় ও কল্পনা যখন একসঙ্গে হয়, তখন কল্পনা অজানাকে তীব্রতর করে তোলে। ফলে অজানা ও গোপন বিষয় সাধারণ ও জানা বিষয়ের চেয়ে বেশি মনোযোগ ও গুরুত্ব পেয়ে থাকে।'[৩৮]

কিন্তু আজ যা গোপন আছে, তা সব সময়ই যে তেমনি থাকবে, তা নয়। সিমেল বলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে সমাজের যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেই

পরিবর্তনের একটি মজার বৈশিষ্ট্য হলো, অতীতে যা একেবারেই প্রকাশ্য ছিল তা কালের আবর্তে নিজেকে গোপনীয়তার আবরণে লুকিয়ে ফেলে। অন্যদিকে আগের গোপন বিষয়গুলোরও যখন গোপনীয়তার ঢালের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের সবার জন্য উন্মুক্ত করে।'[৩৯] এ বিষয়ে সবিস্তারে তিনি বলেন, আগে রাজকর্মচারীদের কাজকর্মকে একেবারে নিয়মমাফিকভাবে সাধারণের জন্য রহস্যাবৃত করে হাজির করা হতো। সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতেও বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ, তাদের কর ও শুল্কের পরিমাণ, সেনাবাহিনীর আকার ইত্যাদি বিষয়ে চরম গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। ফলে রাষ্ট্রের অনেক বিষয়ে রাজদূত আর গুপ্তচর উভয়ের জানার পরিধি প্রায় একই রকম ছিল। পরে উনিশ শতকে যখন জন-ক্ষমতায়ন হলো, প্রশাসনের প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হলো, শাসনযন্ত্রের দক্ষতা অনেক গুণ বাড়ল, তখন রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য তথ্য প্রচারের বিষয়টা এতই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে আগে যে বিষয়গুলো গোপন না থাকলে রাষ্ট্র একেবারে রসাতলে যাবে বলে ধরে নেওয়া হতো, সরকার সেগুলোকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সবার জন্য প্রকাশ করতে শুরু করল। ইসলামের ইতিহাস থেকেও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নবুয়তপ্রাপ্তির প্রথম কয়েক বছর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁদের ধর্মের বাণী প্রকাশ্যে প্রচার করেননি; গোপনে করেছেন। এ সময়ে তাঁদের আচরণের সঙ্গে গোপন সংগঠনের আচরণের পার্থক্য করা মুশকিল হবে। তারপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ তাঁদের সক্ষমতার পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাপেক্ষে তাঁরা তাঁদের বাণীকে প্রকাশ্যে প্রচার করতে শুরু করেছেন।

জর্জ সিমেলের মতে, একাকী জগতে সব বিষয়ই গোপন, কিংবা সবকিছুই প্রকাশিত। সমাজে যেকোনো গোপন বিষয়ের পক্ষ থাকে দুটি। কোনো বিষয়কে গোপন করার উদ্দেশ্যই হলো, যাকে 'পর' বিবেচনা করা হচ্ছে, তার জ্ঞানের পরিধিকে নির্দিষ্ট সীমায় আটকে রাখা, সীমার বাইরে যেতে না দেওয়া; এককথায় অন্যের জানাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সে জন্য সিমেলের প্রস্তাব হলো, গোপন বিষয়ের গবেষণার জন্য প্রথমে আমাদের নজর দিতে হবে যিনি গোপন করছেন তাঁর দিকে নয়, বরং যাঁর (বা যাঁদের) কাছ থেকে গোপন করা হচ্ছে, তাঁদের দিকে। অর্থাৎ যে বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানকে গোপন করা হচ্ছে, সে জগতের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি।[৪০]

আর কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যখন নিজেদের মত-পথ ও বিশ্ববীক্ষাকে গোপন রাখতে চায়, তখন বুঝতে হবে যে তারা আসলে বিদ্যমান মত-পথ ও বিশ্ববীক্ষা থেকে ভিন্ন কোনো এক বিকল্পকে ধারণ করে।[৪১]

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যখন বিরূপ থাকে, তখন গোপনীয়তা একটি রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; আর বন্ধুত্বপূর্ণ কিংবা উপযুক্ত পরিবেশে গোপন আর গোপন রাখার প্রয়োজন পড়ে না। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে যদি বাক্‌স্বাধীনতা, মত ও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে, গোপনীয়তা নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে 'পর'-এর যদি 'ঘর'কে জানার জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকে, পর যদি আর আক্রমণাত্মক না হয়, তাহলে ঘর ও পরের মধ্যে তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদানে নৈতিকতা তো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অন্তুতপক্ষে উচিত নয়।

লালনের রাজনৈতিক পাঠ-পদ্ধতি

লালনের বুর্জোয়াকরণের জন্যই হোক আর লালনের কালামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের জন্যই হোক, লালনের ব্যাপারে জন-আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। আর আমরা লালনকে বেছে নিয়েছি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার কিছু সূত্র খোঁজার জন্য অবলম্বন হিসেবে। সে ক্ষেত্রে লালনের রাজনৈতিক পাঠ কীভাবে সম্ভব? নিঃসন্দেহে লালনের রাজনৈতিক পাঠ একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। কারণ, প্রায় সাত দশক ধরে লালনের বিদ্যায়তনিক চর্চার পরেও লালনকে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ দুটি। প্রথমত, মরমিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লালনের মূল্যায়নের কারণে তাঁর বাণীর রাজনৈতিক তাৎপর্য এত দিন ধরা পড়েনি। দ্বিতীয়ত, লালনের কালামের প্রতীকী এবং কাব্যিক ভাষার কারণে তাঁর রাজনৈতিক অর্থ হয়তো চাপা পড়ে গেছে। ফলে লালনের কালামের রাজনৈতিক পাঠের একটি বিপদের দিক হলো, কেউ দাবি করে বসতে পারেন যে লালনের নামে যা কিছু বলা হচ্ছে, তা নেহাত আরোপণ। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, লালনকে রাজনৈতিকভাবে পাঠের ক্ষেত্রে কিছু মাত্রায় আরোপণ হবে না, সে নিশ্চয়তা কম। এ ব্যাপারে সক্রেটিস চর্চা আমাদের পথ দেখাতে পারে। প্লেটোর সংলাপ *রিপাবলিক*-এর সূত্র ধরে আমরা যখন সক্রেটিসের রাজনৈতিক দর্শন আলোচনা করি,

তখন সে আলোচনার মধ্যে কতটা আরোপণ আর কতটা বস্তুনিষ্ঠতা থাকে, সে বিষয়ে আমরা কি নিশ্চিত হতে চাই, নাকি যুগে যুগে নতুন নতুন প্রেক্ষাপটে সক্রেটিসের বরাতে আমরা চলমান সংকট মোচনের সূত্র সন্ধান করি মাত্র? একই কথা বলা যেতে পারে হালের শেক্‌সপিয়ার-চর্চার ক্ষেত্রেও। উদাহরণ হিসেবে *টেম্পেস্ট*-এর কথা বলা যায়। এটি নেহাতই একটি নাটক। লেখা হয় ১৬১০ কিংবা ১৬১১ সালে। বিলাতি কিংবা ইউরোপীয় উপনিবেশ তখনো গড়ে ওঠেনি। আধুনিক পণ্ডিতেরা সেই নাটকের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে নাটকটি শুধু একধরনের সংস্কারকেই তুলে ধরে না, ঔপনিবেশিকতাকে তৈরি করে এবং উসকে দেয়। সেদিক থেকে *টেম্পেস্ট* একটি রাজনৈতিক কাণ্ড।[৪২] অর্থাৎ, যদিও *টেম্পেস্ট* লেখা হয়েছে ঔপনিবেশিকতা তৈরি হওয়ার এবং এর তত্ত্বায়ন হওয়ার বহু আগে, তারপরও আমরা দেখি সমকালীন পণ্ডিতেরা তাঁদের সমসাময়িক চিন্তা ও বাস্তবতার আলোকে ঐতিহাসিক টেক্সটকে বিশ্লেষণ করছেন। লালনের কালামের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আমরা একই যুক্তি দেখাতে চাই। তাই আমাদের বক্তব্য হলো, কিছু মাত্রায় আরোপণের ঝুঁকি সত্ত্বেও আমাদের লালনের রাজনৈতিক পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

এখন কথা হলো, লালনের কালামের প্রতি 'বিশ্বস্ত' থেকে আধুনিক বিদ্যায়তনিক কাঠামোতে লালন-চর্চার বৈধতা বিষয়ে দুটি বিষয় আগেই বলা দরকার। প্রথমত, যেহেতু পশ্চিমা ধারণাগুলোকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করে আমার (এবং আমাদের) 'জ্ঞানচর্চা'র শুরু, সেই হেতু আমাদের আলোচনার পাটাতনকে পশ্চিমা বলে অভিযোগ করার সুযোগ আছে। এই চর্চা উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তকদের বিচারে দোষণীয় বলে গণ্য হতে পারে। আমরা তাঁদের এই বলে সন্তুষ্ট করতে চাইব যে যেকোনো চিন্তার এবং চিন্তার কাঠামোর, পরিচ্ছন্নতার জন্য অন্য ঘরানার চিন্তার এবং চিন্তাকাঠামোর তুলনা দরকার। আর সেই তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি পাটাতন জরুরি। আর এ মুহূর্তে আমাদের বাড়ির কাছের লালনকে বোঝা ও বোঝাবার জন্য আমরা পশ্চিমা পাটাতনকেই ব্যবহার করছি। কেননা, জাক দেরিদার সঙ্গে আমরাও একমত যে এ মুহূর্তে গ্রিকো-ইউরোপীয় প্রকল্পের ফলে যে মৌলিক চিন্তাব্যবস্থার জন্ম নিয়েছে, তা সমগ্র মানবতাকে ঘিরে ধরেছে...আর কোনো দর্শন যদি একে বদলে দিতে চায়, তাহলে হয় এর মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, নয়তো দার্শনিক ভাষা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নিজের লয় ঘটাতে হবে।[৪৩] আর উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার লক্ষ্যকে আমাদের লক্ষ্য

হিসেবে কবুল করে আমরা যদি ইউরোপকেন্দ্রিকতাকে ঝেড়ে ফেলতেও চাই, তারপরও গ্রিকো-ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য চিন্তা ও চিন্তাকাঠামোর তুলনামূলক পর্যালোচনা জরুরি।

এখন প্রশ্ন হলো, লালনের রাজনীতি বোঝার জন্য লালনের কালামের সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা কী হতে পারে? সক্রেটিস ও শেক্সপিয়ার চর্চার উদাহরণ যদি আমাদের শিক্ষণীয় হয়, তাহলে লালনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা আমরা দেখাতেই পারি। এটা অনস্বীকার্য যে কোনো টেক্সটই নিজের অর্থ নিজে করতে পারে না। সমাজের কর্তা হিসেবে মানুষই সমস্ত রচনার বিষয়বস্তুর অর্থ তৈরি করে। আর সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও বদলায়। যেমন রাজাকার শব্দটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালে ব্যবহার করত তাদের 'সাহায্যকারী' অর্থে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এই শব্দ গালি হিসেবে, বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে শুধু 'বাণী'কে পাঠ-বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ফলপ্রসূ হবে না। যে প্রেক্ষাপটে 'বাণী' তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ জরুরি। একই সঙ্গে জরুরি যে প্রেক্ষাপটে 'বাণী'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ। যে সময়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেই সময়ের বস্তুগত-অবস্তুগত এবং নৈতিক-রাজনৈতিক চাহিদাকেও বিবেচনায় আনা দরকার। সে জন্যই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আসে, লালনের বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কে করবে? আজকের দিনে লালনের যে লোকপ্রিয়তা, তাতে সাধারণ পর্যায়ের লোকেরাও কিছুটা মাত্রায় লালনচর্চা করে থাকেন। লালনকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার এবং নিজেদের মতো করে প্রয়োগ/ব্যবহার করার লৌকিক অধিকার কে ক্ষুণ্ন করতে পারে? আমরা পারি না। তবে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে সব ব্যাখ্যার মধ্যে অগ্রাধিকার পাবার বিষয় আছে। যদি কোনো 'বাণী' কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে চর্চিত হয়, তবে সেই বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার চর্চাকারীদের ব্যাখ্যাই প্রাধান্য পায়। চর্চাকারীদের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পাওয়ার মানে এই নয় যে কোনো 'বাণী'র জনব্যাখ্যা নিষিদ্ধ। লালনের 'ঘরের' চর্চা সম্পর্কিত যেকোনো কালামের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের ব্যাখ্যা সব ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য। সুধীর চক্রবর্তী এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, এখন যারা বাউল হিসেবে পরিচিত হচ্ছে, তারা কেউ বাউল নয়, বাউল সাধনাও করে না, তারা গায়ক'।[৪৪] এর কারণ কী? তিনি বলেন, 'সারা বঙ্গসমাজে এবং বহির্ভারতে বাউলদের নিয়ে যে তীব্র আগ্রহ, যাকে

ইংরেজিতে বলে 'ক্রেজ', তার বাড়াবাড়ির মধ্যে অনেক 'সাজা বাউল' ঢুকে পড়েছে'।[৪৫] আর এর ফল কী ফলছে, সে ব্যাপারে তিনি এক সাধুর মুখের কথা তুলে দিয়েছেন আমাদের জন্য, 'এখন এসব 'গপোন' [গোপন] ব্যাপার বেশ প্রকাশ্য হয়ে গেছে এবং আশ্চর্য যে গুরুর অনুজ্ঞা না মেনে এখন বাউল বোষ্টমরা গড়গড় করে পেট খালাস করে সব উগলে দেয় আর তাতে মিশোয় প্রভূত স্বকল্পিত ব্যাখ্যান'।[৪৬]

আমরা এখানে লালনকে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করতে চাই। আর সে লক্ষ্য অর্জনে আমাদের উচিত হবে লালনের কালামের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান অনুসন্ধান করা। সে জন্য আমাদের অ্যাপ্রোচটি হবে প্রধানত ইন্টারপ্রিটেটিভ বা ব্যাখ্যামূলক। তবে সে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লালনের প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যকারদের মতও ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্বের সঙ্গে আমরা বিবেচনা করব। সুধীরের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা শুধু মনে রাখব যে লালনের ভাষ্যকারমাত্রই লালনচর্চাকারী না-ও হতে পারেন; তিনি শুধু লালনসংগীতের গায়কও হতে পারেন। একটি ব্যাপার পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন, রাজনৈতিকভাবে লালনকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রচেষ্টা একেবারেই 'প্রাক্-প্রাথমিক' পর্যায়ের। ভবিষ্যতে লালন অনুসারীদের কেউ উৎসাহী হয়ে রাজনৈতিক লালনকে আরও সার্বিকভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন, সেটাই প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

১. Carol Salomon, 'The Cosmic Riddles of Lalan Fakir', in Arjun Appadurai, Frank J Korom and Margaret A Mills eds. *Gender, Genre, and Power in South Asian Expressive Traditions*, New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994, p. 267

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৩৩, পৃ. ২৪-৫৮।

৩. বসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস, ছাপার সন ও তারিখবিহীন।

৪. দেখুন, কাজী মোতাহার হোসেন, *সাধক লালন শাহ*, পৃ. ৭৫৩-৭৬২, জসীমউদ্‌দীন, লালন ফকির, পৃ. ৭৬৩-৭৭৭, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *লালনসমগ্র*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯।

৫. আহমাদ মাযহার ও পারভেজ হোসেন, *লালন ফকির : পাঠ ও বিবেচনা*, ঢাকা : সংবেদ, ২০১৬; Abu Ishahaq Hossain, *Lalon Shah: The Great Poet*, Dhaka: Palal Prokashani, 2009; আবদেল মাননান, *লালনদর্শন*, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৭।

৬. শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল : উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন*, কলকাতা : দে'জ, ২০১০ [১৯৯৯]।

৭. সুধীর চক্রবর্তী, *গভীর নির্জন পথে*, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২/১৯৮৯; এ ছাড়া *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, কলকাতা : প্রজ্ঞা, ১৯৯০।

৮. সুধীর চক্রবর্তী, *বিচিত্র লোকায়ত*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ১০৬।

৯. June McDaniel, 'The Embodiment of God Among the Bauls of Bengal', *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol. 8, No. 2, 1992, pp. 27-39; Charles Capwell, 'The Popular Expression of Religious Syncretism: The Bauls of Bengal as Apostles of Brotherhood', *Popular Music*, Vol. 7, No. 2, The South Asia/West Crossover, 1988, pp. 123-132.

১০. Charles H. Capwell, *op. cit.*, p. 255.

১১. Carol Salomon, *op. cit.*, p. 271.

১২. Atis Dasgupta, 'The Bauls and their Heretic Tradition', *Social Scientist*, Vol. 22, No. 5/6, 1994, pp. 70-83.

১৩. June McDaniel, *op. cit.*, pp. 27-28.

১৪. Charles Capwell, *op. cit.*

১৫. Anirban Mondal, 'Searching for Moner Manush (Man of Heart): Bauls of Bengal and Fakir Lalon Shah', *Journal of Bengal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2015, pp. 58-65; Muchkund Dubey, 'The Sadhana of Lalan Fakir', *India International Centre Quarterly*, Vol. 24, No. 2/3, Crossing Boundaries, 1997, pp. 139-150.

১৬. Carol Salomon, op. cit., p. 271.

১৭. Trina R Mamoon, 'Conversions/Subversions: Sufi Subtexts of Bangladeshi Identity', *Comparative Civilizations Review*, Vol. 59, No. 59, 2008, pp. 143-144. তিনি লেখেন, "...the name of Lalon Shah (1774-1890), also known as Lalon Fakir (mystic), resonates deeply with the poetic Bengali sensibility. Lalon was a powerful voice of secularism and nationalism in colonial India who openly opposed the British rule'।

১৮. Fabrizio M. Ferrari, 'Mystic Rites for Permanent Class Conflict: The Bauls of Bengal, Revolutionary Ideology and Post-Capitalism', *South Asia Research*, Vol. 32, No. 1, 2012, p. 21.
১৯. Fabrizio M. Ferrari, *op. cit.*, p. 34.
২০. Fabrizio M. Ferrari, *op. cit.*, p. 34.
২১. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
২২. সুধীর চক্রবর্তী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০১০, পৃ. ৬৫।
২৩. আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান*, ঢাকা : পারিজাত প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১৫৮।
২৪. মুন্সী আব্দুল মান্নান, 'লোকসাহিত্য ও লালন-গীতির দর্শন', *লালন পরিষদ পত্রিকা*: শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৫; এবং বেগম জাহান আরা, 'লালন-গীতির দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা', *লালন পরিষদ পত্রিকা*: শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫; উভয়টি উদ্ধৃত হয়েছে আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২, পৃ. ৬৬।
২৫. উদ্ধৃত, Muchkund Dubey, The Sadhana of Lalan Fakir, *India International Centre Quarterly*, Vol. 24, No. 2/3, 1997, p. 141.
২৬. William Kingsland, *An Anthology of Mysticism and Mystical Philosophy*, London: Methuen & Co., 1927, pp. vi-vii.
২৭. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ : ৪৭৫
২৮. ফরহাদ মজহার, *সাঁইজীর দৈন্য গান*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ৫১।
২৯. Fabrizio M. Ferrari, *op. cit.*, p. 23.
৩০. Carol Salomon, 'The Cosmic Riddles of Lalan Fakir', in Arjun Appadurai, Frank J Korom and Margaret A Mills eds. *Gender, Genre, and Power in South Asian Expressive Traditions*, New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.
৩১. Carol Salomon, *op. cit.*, p. 295.
৩২. Carol Salomon, *op. cit.*, p. 268.
৩৩. ফরহাদ মজহার, *বাংলার ভাবান্দোলন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।
৩৪. Ananda Shankar Ray, Quoted in Muchkund Dubey, 'The Sadhana of Lalan Fakir', *Indian International Center Quarterly*, Vol. 24, No. 2/3, Crossing Boundaries, 1997, p. 147.
৩৫. Carol Salomon, *op. cit.*, p. 280; Charles H. Capwell, 'The Esoteric Belief of the Bauls of Bengal', *Journal of Asian Studies*, Vol. 33, No. 2, 1974, pp. 255-264.

৩৬. Hugh B Urban, *The Economics of Ecstasy: Tantra, Secrecy, and Power in Colonial Bengal*, New York: Oxford University Press, 2001, p. 25.

৩৭. Hugh B Urban, 2001, *op. cit.* p. 15.

৩৮. Georg Simmel, *The Sociology of Goerg Simmel*, eds. Kurt H Wolf, Illinois: The Free Press, 1950, p. 333.

৩৯. Georg Simmel, *op. cit.*, pp. 330-331.

৪০. Georg Simmel, *op. cit.*, p. 324.

৪১. Georg Simmel, *op. cit.*, p. 330.

৪২. Meredith AnneSkura, Discourse and the Individual: The Case of Colonialism in 'The Tempest', *Shakespeare Quarterly* vol. 40, no. 1, 1989, p. 45.

৪৩. Jacques Derrida, *Writing With Difference*, New York: Routledge, 1978/1967, p. 101.

৪৪. সুধীর চক্রবর্তী, *বিচিত্র লোকায়ত*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ১০৭।

৪৫. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১২২।

৪৬. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১৫৩।

চেতনায়নের রাজনীতি

[T]he way we define politics can profoundly affect how we 'do' politics.[১]

আমরা কোন রাজনীতি কীভাবে করব, তা নির্ভর করে আমাদের রাজনীতির সংজ্ঞার ওপর। সে জন্য প্রথমে রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝব, সে বিষয়ে কিছু কথা বলা জরুরি। এড্রিয়ান লেফটউইচের কথা ধার করে আমরা বলতে পারি, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যেকোনো পরিসরে সম্পদের ব্যবহার ও বন্টন বিষয়ে সহিংস অথবা অহিংস যেকোনো ধরনের সংঘাত-সমঝোতা-সহযোগিতার নাম রাজনীতি।[২] এই সংজ্ঞায় রাজনীতিকে 'তৎপরতা' হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। তবে আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে রাজনীতির সংজ্ঞায়ন নিজেই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। যেসব বিষয় বৃহত্তর পরিসরে রাজনীতিকে নির্ধারণ করে—যেমন অসম ক্ষমতার বন্টন এবং সেই প্রেক্ষাপটে চিন্তা ও বোধের ভিন্নতা, স্বার্থের ভিন্নতা এবং প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য—সেসব বিষয়ই রাজনীতির সংজ্ঞায়ন নির্ধারণ করে।[৩]

রাজনীতির সংজ্ঞা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও একটি বিষয়ে ঠিকই ঐকমত্য রয়েছে: রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলো ক্ষমতা। রাজনীতি যদি কিছু কর্মকাণ্ডের নাম হয়, তাহলে তো বটেই, রাজনীতিকে যদি শুধু চিন্তা হিসেবে দেখি, তাহলেও এর কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতাকে পাব। আর ক্ষমতার উৎস হলো মানুষ। সম্পদ (ওয়েলথ বা রিসোর্স) বা মূল্যবোধ ক্ষমতার উৎস নয়। কেননা, মানুষের অনুপস্থিতিতে 'সম্পদের প্রাচুর্য' কথাটা যেমন অর্থহীন, 'অভাব' ধারণাটাও ততটাই অর্থহীন। মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ যখন সংগঠিত হয়, তখনই ক্ষমতা তৈরি হয়। এ ব্যাপারে হানা আরেন্ডটকে আমরা

উদ্ধৃত করতে পারি: ক্ষমতা ব্যক্তির একার সক্ষমতা থেকে তৈরি হয় না। ক্ষমতা তৈরি হয় সংগঠিত হয়ে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করার সক্ষমতা থেকে। সেদিক বিবেচনায়, ক্ষমতা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ক্ষমতার মালিক হলো সমষ্টি। সামষ্টিক ঐক্য যত দিন থাকে, ক্ষমতাও তত দিন। আমরা যখন কাউকে ক্ষমতাবান বলি, তখন আসলে বোঝাই যে তাঁর নামে একদল মানুষ কাজ করে। আর দলের মাধ্যমেই তিনি ক্ষমতায়িত হয়েছেন। যে সংঘবদ্ধতার ফলে ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল, সেই সংঘবদ্ধতা যে মুহূর্তে ভেঙে বিলীন হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই ব্যক্তির ক্ষমতা হাওয়া হয়ে যায়।[৪]

রাজনীতির মাধ্যমে যে ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটে, তা দিয়ে কী হবে? ক্ষমতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসন এবং লোকনীতি নির্ধারণ। এখন, শাসন বলতে আমরা কী বুঝব? রাজনীতিবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টনের মতে শাসন মানে হলো সংশ্লিষ্ট সমাজে যথাযথ কর্তৃত্বের অধীনে মূল্যের বণ্টন (authoritative allocation of values)। এই মূল্য বস্তুগত ও অবস্তুগত (প্রতীকী) দুই ধরনেরই হতে পারে। মিশেল ফুকোর মতে, শাসন আবার দুই প্রকার: নিজের ওপর নিজের শাসন, যাকে অনেকেই নৈতিকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন; আরেকটি হলো অন্যের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যায়তনে রাজনীতি অধ্যয়নের নামে এটিই বহু চর্চিত।

ক্ষমতার উৎস মানুষ

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ক্ষমতার উৎস। আবার, মানুষের ওপর অন্য কোনো মানুষ এই ক্ষমতা বিচিত্ররূপে প্রয়োগ করে। ক্ষমতা মানুষের মাঝে বিরাজ করে। ক্ষমতা শুধু একটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই প্রয়োগ করে না। জেমস স্কট দেখান যে আপাতদৃষ্টিতে যাঁদের ক্ষমতাহীন ও ব্রাত্যজন মনে হয়, তাঁরাও তাঁদের মতো করে ক্ষমতার বলয় তৈরি করেন কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।[৫] আবার, মানুষ ক্ষমতা অর্জন করে অন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। মা-বাবা সন্তানকে, বড় ছোটকে, শিক্ষক ছাত্রকে, নেতা কর্মীকে, বড় ডাক্তার ছোট বা হবু ডাক্তারকে, বড় কর্তা ছোট কর্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার ব্যাপারগুলো উল্টো দিক থেকেও ঘটে। আবদারের নামে সন্তান মা-বাবাকে দিয়ে নিজের স্বার্থটা হাসিল করে নেয়; স্নেহের দোহাই দিয়ে ছোট বড়র কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারে, তেমনি পারেন অন্য সবাই। সেদিক থেকে দেখলে, বাস্তবে কেউই চূড়ান্ত অর্থে ক্ষমতাহীন নয়।

অন্যদিকে, ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণভাবে লালিত ও প্রচারিত মত হলো মানুষ ক্ষমতার হাতের পুতুলমাত্র। ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্রের কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, ক্ষমতা থাকে সমাজের নিয়মের মধ্যে। এসবের সঙ্গে মানিয়েই বুঝি তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাই ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল নিতে চায়, চায় জবরদস্তির সব হাতিয়ারের ওপর একচ্ছত্র অধিকার। আর সাধারণভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের জন্য যেকোনো তৎপরতাই রাজনীতি হিসেবে পরিচিত। ফলে রাজনীতি একেবারেই ব্যক্তির বহিরাঙ্গের বিষয় (বা এক্সটারনাল) হিসেবেই থেকে যায়। এই প্রেক্ষাপটে রাজনীতিকে আমরা প্রক্রিয়া, কৌশল বা তৎপরতা—যে হিসেবেই বিবেচনা করি না কেন, রাজনীতির লক্ষ্য হয় : অন্যকে নিয়ন্ত্রণ, অন্যকে বশ করা।

কাজেই কথা ওঠে, কে অপরকে বশ করবে? কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? কার নিয়ন্ত্রণ আগে প্রয়োজন? পণ্ডিত-অপণ্ডিতনির্বিশেষে সবাই বোঝেন—যিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, যিনি বশ করবেন, তাঁর নিয়ন্ত্রণ আগে; যিনি বশীভূত হবেন, তাঁর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পরে। কিন্তু প্রচলিত রাজনীতি নিয়ে যারা যাঁরা চিন্তিত, বিশেষ করে যাঁরা তাত্ত্বিক, তাঁদের মধ্যে এ সচেতনতার অনুপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। বলা প্রয়োজন, প্লেটো তাঁর আদর্শ সমাজের রূপরেখায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের যথার্থ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে বিষয়টি প্রায় অচর্চিত থেকে গেছে। নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসেবে 'অপর' প্রসঙ্গ আসার আগেই যে বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ জরুরি, তা হলো খোদ নিয়ন্ত্রণ-আকাঙ্ক্ষীর; অর্থাৎ নিজের। অর্থাৎ 'অপর' প্রাসঙ্গিক হওয়ার আগে নিজের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা জরুরি। আর তাই লালনের সব প্রচেষ্টা 'নিজ'কে বা 'আত্ম'কে প্রাসঙ্গিক করার। তাঁর যদি কোনো রাজনীতি থেকে থাকে, তাহলে সেটা পরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বোধ-বুদ্ধির মানুষ হিসেবে সমাজে ক্রিয়াশীল থাকার জন্য। সে জন্যই হয়তো লালনের কালামে অপরের ওপর জবরদস্তি করার বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কোনো প্রকল্প অনুপস্থিত। এমনকি অপরকে কৌশলে ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষাও অনুপস্থিত। উপস্থিত কেবল নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার সহজিয়া ভাব। লালনের রাজনীতি নিজেকে প্রাসঙ্গিক করার রাজনীতি। নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখার রাজনীতি।

প্রশ্ন আসতে পারে, নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে কেন? নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আগে কেন? আত্মজ্ঞান জরুরি দুটো কারণে। প্রথম কারণটি তাত্ত্বিক (দার্শনিক)। দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। মানুষ যখন অন্য সবার সঙ্গে বিচিত্রভাবে

বিচিত্র রকম সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তখন আমরা সেই সম্পর্ক-সমষ্টিকেই সমাজ বলে চিহ্নিত করি। এই সম্পর্কগুলো কখনোই একমাত্রিক নয়। বরং জটিল এবং বহুস্তরবিশিষ্ট। আর মানুষ নিজেকে, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বকে জানান দেয় এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমেই। সেই অর্থে, ব্যক্তির অস্তিত্বমাত্রই সামাজিক অস্তিত্ব। এটা তৈরি হয় ঐতিহাসিকভাবে, এক বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আর তাত্ত্বিকভাবে আমরা যদি মানুষকে, অর্থাৎ মানুষের সত্তাকে পেতে চাই, তাহলে সামাজিক মানুষকে তার ঐতিহাসিকতা ও বাস্তব প্রক্রিয়া (বা ন্যাচারাল প্রসেস) থেকে আলাদা করতে হবে। ব্যাপারটিকে সোজা ভাষায় লালন-অনুসারী ফকির মো. আলী শাহ তাঁর আলাপচারিতায় ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'আপনার কী নাম? ফিরোজ। এই ফিরোজ একটা মানুষ। এই ফিরোজের ভেতরে কিন্তু আরেকটা ফিরোজ বাস করছে। ওই ফিরোজটাকে পেতে হলে এই ফিরোজটাকে সাধনা করতে হবে। এই ফিরোজটাই হচ্ছে মূল। বাহ্যিক ফিরোজের ভেতর দিয়ে ভেতরের ফিরোজটাকে পাওয়া যাবে। এই হচ্ছে সাঁইজির থিম, সংক্ষেপে।'[৬] তাই আমরা বলতে পারি, মানুষের অন্তর্গত প্রকৃতি বোঝার জন্য আত্মজ্ঞান জরুরি।

এবার রাজনৈতিক কারণটি ব্যাখ্যা করা যাক। মানুষ ব্যক্তি, সমষ্টি, গোত্র, জাতি, নাগরিক ইত্যাদি হিসেবে বেঁচে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে অপর ব্যক্তি, বস্তু ও ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। প্রতিটি সম্পর্ক আবার একেকটি পরিচয় নির্মাণ করে। যেমন—আমি কারও পুত্র, কারও ভাই, কারও বাবা, কারও বন্ধু, কারও আবার শত্রু। প্রতিটি আলাদাভাবে এবং সব কটি একই সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় তৈরি হতে পারে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেও। যেমন ভূমির সঙ্গে কারও মালিকানার সম্পর্ক থাকতে পারে। তিনি জমিদার। আবার ভূমিতে মালিকানা-বর্জিত শুধু উৎপাদনের সম্পর্কও থাকতে পারে কারও। তিনি ভূমিদাস। জমিদার ও ভূমিদাস আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছাড়া, কোনো ধারণার সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেও পরিচয় তৈরি হয়। যেমন রাষ্ট্র একটি ধারণা। এর নিরিখে আমি বাংলাদেশের নাগরিক আর হিলারি ক্লিনটন একজন বিদেশি। আর সেই পরিচয়কে আশ্রয় করেই মানুষ বেঁচে থাকে। প্রতিটি পরিচয়, প্রতিটি সম্পর্কও আবার বিচিত্র বিষয়াবলি দ্বারা নির্ণীত হয়। বিচিত্র সম্পর্কের মাঝে স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে ব্যক্তি কর্তাসত্তা বা সাবজেক্ট হিসেবে হাজির থাকেন। সব ক্ষেত্রেই মতাদর্শ একজন মানুষকে সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে। এই মতাদর্শের কারণেই, লুই আলথুসার বলেন,

ব্যক্তি নিজেকে ভুলে যায়।[৭] মতাদর্শ ও ব্যক্তিসত্তা একটি আরেকটির সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে জটিল সামাজিক সম্পর্কগুলোকে একেবারেই সরল মনে হয়। আর সামাজিকভাবে তৈরি হওয়া ব্যক্তিসত্তাকে মনে হয় যেন প্রকৃতিপ্রদত্ত। সত্যিকারের সামাজিক সম্পর্ক যেসব বিষয় দিয়ে নির্ণীত হয়, মতাদর্শ সেগুলোকে অস্পষ্ট বা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে। একই সঙ্গে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে ব্যক্তির নিজের গঠনকেও।[৮] আলথুসার বলেন, যে বাস্তব সম্পর্কের জালের মধ্যে মানুষের বসবাস; সেই সম্পর্কের বিষয়ে মানুষের যে ঘোর তৈরি হয়, সেটিই মতাদর্শ।[৯] এই ঘোর আবার একই সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতারও ইঙ্গিত।

ঘোরাচ্ছন্ন মানুষ ক্ষমতার দাস, মালিক নয়

ব্যক্তির মাঝে ঘোর তৈরি হতে পারে দুটি কারণে। প্রথমত, আধিপত্যশীল শ্রেণির কারসাজির কারণে (আর এ ব্যাখ্যা কাণ্ডজ্ঞাননির্ভর হওয়ার কারণে বেশি জনপ্রিয়); দ্বিতীয়ত, নিজের উৎপাদিত শ্রমের ফল-ফসলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে একসময় নিজের শ্রমের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। ফলে সে সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন সে জীবনের বাস্তবতাকে ঘোরের মধ্যে ঠেলে দেয়। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, তার সমগ্র বাস্তবতাই তো বিচ্ছিন্নতাময়। সোজা কথা, ব্যক্তি বাস্তবতার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে বলে কল্পনা করে নেয়, সেটাই মতাদর্শ। দার্শনিকের বরাত দিয়েই সমাজে চালু থাকুক কিংবা আল্লা-ঈশ্বর-ভগবানের নামেই চালু থাকুক, মতাদর্শ সব সময়ই মানুষের দ্বারা ও মানুষের জন্য। মতাদর্শ গঠনের ও টিকে থাকার মূল নিয়ামক হলো ব্যক্তি। আর ব্যক্তির ওপর মতাদর্শ সব সময়ই ক্রিয়াশীল থাকে। তাই তার কাছে সমাজের প্রচলিত-প্রতিপত্তিশীল সবকিছুকে স্পষ্ট-সত্য-সঠিক ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এটা হলো মতাদর্শিক স্বীকৃতি বা ইডিওলজিক্যাল রিকগনিশন। আর ব্যাপারটা এত স্বতঃস্ফূর্ত যে মতাদর্শ কখনো নিজেকে বলে না (বা বলতে পারে না) যে আমি মতাদর্শিক (পাগল যেমন নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে পাগল বলে)। স্মর্তব্য, লালনের আজীবন আক্ষেপ, 'আমার মনের ঘোর গেল না'।

ফলে খোদ ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে না। তখন নিজেকে অচেনা মনে হয়। ব্যক্তি নিজেকে তখন নিজের বাইরে খোঁজে। আলথুসার যখন বলেন যে মতাদর্শ ব্যক্তিসত্তাকে তৈরি করে, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে

তিনি বুঝি সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক বা মৌলকাঠামোর ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন। মতাদর্শ যে মোটাদাগে সমাজের মৌলকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল, সে ব্যাপারে তিনি কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে একমত: মতাদর্শ সমাজের উপরিকাঠামো এবং সেটা মৌলকাঠামো থেকেই উদ্ভূত। আলথুসার শুধু যোগ করেন যে সমাজে দীর্ঘ মেয়াদে মৌলকাঠামোর টিকে থাকার জন্য যে শর্তগুলোর পুনরুৎপাদন জরুরি, মতাদর্শ সেগুলো তৈরি করার প্রক্রিয়াকে চালু রাখে।

আর সামাজিকীকরণের বাহনগুলোর সঙ্গে—যেমন পরিবার, বিদ্যায়তন, ধর্মশালা, ক্লাব, গণমাধ্যম ইত্যাদির সঙ্গে—মতাদর্শের কী সম্পর্ক? এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ এবং আচার-অনুষ্ঠান থাকে, মতাদর্শ তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাই এদের বলা যায় মতাদর্শিক যন্ত্র বা ইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস। আলথুসার বলেন, এই মতাদর্শিক যন্ত্রগুলো রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো সত্যজিৎ রায়ের 'যন্তর-মন্তর ঘরে'র (*হীরক রাজার দেশে*) অত্যাবশ্যক উপাদান। এই যন্তর-মন্তর ঘরেই মানুষ নিজেকে হারায়। নিজের প্রকৃত সত্তাকে হারায়। পরাধীন হয়। মানুষ নিজেকে হারিয়ে যে জীবনকে যাপন করে, সেটা তার মানবিক আকাঙ্ক্ষার জীবন নয়। ঘোরাচ্ছন্ন জীবন। আর ঘোরাচ্ছন্ন জীবনমাত্রই শোষণ-বঞ্চনার সহজ শিকার। এই ঘোর-উদ্ভূত জীবন-বোধ ও শোষণ-বঞ্চনা নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয় মতাদর্শের সাহায্যে। পুনরুৎপাদন ঘটে ব্যক্তিমানুষের সচেতনতায়। মতাদর্শ মানুষকে নিজের দিকে অবিরাম ডাকে, নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে মানুষের অন্তর্গত রূপান্তর ঘটে। মতাদর্শিক মানুষ থাকে একান্তভাবেই বাধ্য। যেন দাস, মতাদর্শের দাস। আর যখন যে দাস হয়ে গেল, তখন এই অবস্থাকেই তার স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে। অথচ সে নিজেকে স্বাধীন বা অটোনোমাস মানুষ হিসেবে ভাবতে থাকে।

তাহলে সমাধান কী? আলথুসারের বক্তব্য অনুযায়ী, শোষণমূলক অন্যায্য সম্পর্ককে যদি নিঃশেষ করতে হয়, তাহলে যে কারখানায় অন্যায্য সম্পর্কের পুনরুৎপাদন হয়, সেটি বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের সচেতনতার পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। আলথুসার বলেন, সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলোও মতাদর্শের ওপরই চলে। অন্যদের থেকে বিপ্লবীদের ভিন্নতা হলো: তাঁরা চলে সর্বহারার মতাদর্শের ভিত্তিতে [এটি রাজনৈতিক এবং একই সঙ্গে নৈতিক]। তাঁদের মতাদর্শ অন্যদের মতো নয়; কারণ, মার্ক্স ও লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-কার্যক্রমের ফলে তাঁদের রূপান্তর ঘটেছে।[১০]

কী আশ্চর্য কথা! অন্যান্য মতাদর্শ মানুষকে ঘোরের মধ্যে রাখে, তাই সেগুলো বর্জনীয়। আর মার্ক্স ও লেনিনের প্রবর্তিত মতাদর্শ বিজ্ঞানসম্মত! তাই এই মতাদর্শ আদরণীয়। এ তো যেন একেবারে বাঘের খাঁচা থেকে সিংহের ডেরায় নিয়ে যাওয়া। এক যন্তর-মন্তর ঘর থেকে অন্য যন্তর-মন্তর ঘরে ঢোকা। আমরা কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্ক্স ও লেনিন প্রবর্তিত যন্তর-মন্তর ঘর কতটা তীব্রভাবে মানুষের স্বাধীনতাকে সংকুচিত ও ব্যাহত করতে পারে, তা দেখিনি? আমরা দেখেছি। তাই আমরা ভেবে অবাক হই, আলথুসার একধরনের ভাবাদর্শকে খারিজ করে একই রকম আরেকটি ভাবাদর্শকে এতটা ভক্তি প্রদর্শন করতে পারলেন!

লালনের রাজনীতি চেতনায়নের রাজনীতি

আলথুসার মতাদর্শের বিপদ সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও লালন 'ঘোর' বা 'মতাদর্শে'র বিপদের ব্যাপারে আগে থেকেই সজাগ। তাই তাঁর দাওয়াই একেবারেই সাদামাটা। সর্বজনীন। নিজেকে জানো। নিজেকে স্বরূপে চেনো। লালনের ভাষায়, আত্মতত্ত্ব জানা। 'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে দিব্যজ্ঞানী যে হয়েছে/ কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে'। অন্য সব মতাদর্শের রাজনীতি যেখানে সবাইকে ঘোরাচ্ছন্ন করে, লালন সেখানে একা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে উল্টো কথা শোনাচ্ছেন। লালনের রাজনীতি হলো নিজেকে স্বরূপে আবিষ্কার করার রাজনীতি। ঘোর দূর করার রাজনীতি। তিনি আশা করেন যে ঘোর দূর হলে শোষণমূলক ও অন্যায্য সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে যে মতাদর্শ, তার পুনরুৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি আলথুসারের সীমাবদ্ধতাকে—একটি ঘোর থেকে অন্য আরেকটি ঘোরে বন্দী হওয়ার ব্যাপারকে—অতিক্রম করে যান। আর ঘোর কাটিয়ে ওঠা সাধনার বিষয়, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের বিষয়।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ওপর লালন যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাতে অভিনবত্বের কী আছে? আমরা জানি, খোদ সক্রেটিসের সময় থেকে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের গুরুত্ব স্বীকৃত। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো যে আদর্শ শিক্ষার কথা প্রচার করেছেন, তা সক্রেটিস-পূর্ব এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুকরণে হয়েছিল।[১১] সব সভ্যতাতেই শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের গুরুত্ব স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কথা হলো, এ শিক্ষা কি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল? আমরা জানি, প্লেটো আদর্শ সমাজ নির্মাণের জন্য সবার শিক্ষা গ্রহণকে প্রয়োজনীয় মনে করেননি। তাঁর

শিক্ষানীতি ছিল বর্জনধর্মী। 'অপর' বা 'ছোটলোক'দের শিক্ষাদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করার মনোবাসনা তাঁর ছিল বলে আমরা জানি না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমরা একই রকম কথা বলতে পারি।

অন্যদিকে, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'ঘোর' কাটিয়ে নিজেকে আবিষ্কারের যে প্রস্তাব, তা সর্বজনীন। এবং তা নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, দেশি-বিদেশি সবার জন্য। সবাই নিজ নিজ ঘোর কাটিয়ে নিজের মধ্যে থাকা অমিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করবে। সবাই চেতনার দিক থেকে ক্ষমতায়িত হয়ে উঠবে। মানুষের অন্তর্গত ক্ষমতায়নই বাহ্যিক ক্ষমতায়নের পথ তৈরি করে (আমরা আলথুসার থেকে শিখেছি)। সুতরাং আমরা বলতে পারি, লালনের যদি কোনো রাজনৈতিক প্রকল্প থাকে, সেটা হলো মানুষকে অন্তর্গতভাবে ক্ষমতায়নের প্রকল্প। সবাইকেই তার আপন রাজ্যের 'রাজা' বানানোর প্রকল্প। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। কারণ, তিনি জানেন, চেতনার দৈন্যই প্রকৃত দৈন্য। আর চেতনার সমৃদ্ধিই প্রকৃত সমৃদ্ধি। লালনের রাজনীতিও তাই 'চেতনায়নের' রাজনীতি। লালনের রাজনীতি মানুষকে দার্শনিকভাবে আবিষ্কারের রাজনীতি।

আমাদের সময়ে লালনের রাজনৈতিক পাঠ কীভাবে হতে পারে?

আমাদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে লালনের কালামের রাজনৈতিক পাঠ আমাদের জন্য জরুরি। কিন্তু লালন তাঁর জীবনকালে সুনির্দিষ্টভাবে কী কী রাজনৈতিক পদক্ষেপ বা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সমাজের অধিপতি-শ্রেণির সঙ্গে সরাসরি কোনো মোকাবিলায় গিয়েছিলেন কি না, সেটি নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণী হাজির করা এবং তারপর এর তত্ত্বায়ন একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। কেননা, শিশু লালনের সাধু লালন হয়ে ওঠা সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা যেমন কিছুই আমাদের জানান না, এযাবৎকালের গবেষকেরাও আমাদের নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেন না। লালনের জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কে যা কিছু আমরা জানি, তার প্রায় সবকিছুই জনশ্রুতি। এটা ঠিক যে জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করেও ইতিহাস নির্মিত হতে পারে [আবার এর গ্রহণযোগ্যতাও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেমন আমরা জানি, ইসলামের শেষ নবীর তিরোধানের প্রায় দুই শ বছর পর তাঁর বাণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রক্রিয়ার অধীনে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। সেগুলো আজও প্রায় সব মহলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত]। কিন্তু

কোনো বিষয়ে যদি বেশির ভাগ মানুষের (যাঁরা আবশ্যিকভাবে পরাক্রমশীল ও প্রতিপত্তিশীল) তীব্র ঘৃণা-অবজ্ঞা-প্রতিরোধ থাকে এবং এ ধরনের আবেগের বশবর্তী হয়ে তাঁরা দশকের পর দশক ধরে গবেষণা ও প্রচারণা—দুটোই চালিয়ে যেতে থাকেন, সে ক্ষেত্রে তার বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে যায়। আবার সমাজের আরেকটি ক্ষুদ্র অংশ যদি ওই একই বিষয়ে অনুরাগ পোষণ করে, তাহলে সেই অনুরাগের বিষয়টি নিজেকে গোপনীয়তার মোড়কে লুকিয়ে ফেলে আর আবেগের আতিশয্যে আসল ইতিহাস মিথের রূপ লাভ করে। এই দুই কারণে, লালনের ব্যাপারে জনশ্রুতিনির্ভর একটি বিবরণী তৈরি করা আমাদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। সে জন্য রাজনৈতিক লালনকে তাঁর দৈনন্দিন তৎপরতার মধ্যে আবিষ্কার করার চেষ্টা আমরা এখানে করব না [যদিও সেটা অতীব জরুরি একটা বিষয়]। কেননা, এ জন্য পর্যাপ্ত কৌশল আমাদের হাতে যেমন নেই, পর্যাপ্ত জনবল-অর্থবলও নেই। আমরা এখানে শুধু লালনের কালামের রাজনৈতিক ইঙ্গিতগুলো ধরার চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, যেহেতু আমার প্রশিক্ষণ পশ্চিমা ধারায়, ইঙ্গিতগুলোতেও পশ্চিমা গন্ধ থাকা স্বাভাবিক। তবে, কোনো জায়গা থেকে তো অন্তত শুরু করা উচিত। ভবিষ্যতের গবেষকদের প্রচেষ্টায় এ গন্ধ ধীরে ধীরে অপসৃত হবে, এমন আশা রাখি।

সমস্যা হলো

লালনের সময় এবং আমাদের সময়ের মধ্যে বিপুল তফাত। লালন যে সংকটগুলো মোকাবিলা করেছেন, সে সংকটের কিছু এখন একেবারেই নেই (যেমন ঔপনিবেশিক শাসন, জমিদারদের শোষণ ও শাসন); আবার কিছু সংকটের মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটেছে (যেমন নারীর অধস্তনতা), আবার কিছু জিনিস এখনো টিকে আছে : যেমন : জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের অজুহাতে মানুষে মানুষে অসমতা। তাহলে আজকের দিনে আমরা লালনকে কোন কোন প্রত্যয়ের নিরিখে আলোচনা করব? যেসব প্রসঙ্গ আজকের যুগে আমাদের নাড়া দেয়, আমরা শুধু সেসব প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই লালনের রাজনৈতিক পাঠ নেব। আমরা লালনকে পাঠ করব সমাজকে আরও ন্যায্য করে তোলার জন্য, গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টির জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, লিঙ্গীয় সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য এবং সর্বোপরি বিকল্প রাজনীতির বয়ানের জন্য, যা সবার সহজ-স্বাভাবিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে।

আমরা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে লালনকে পাঠ করব। কেননা,

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তাদের সামষ্টিক জীবনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এই ন্যায্যতা কখনো স্রষ্টা বা ঈশ্বরের বরাত দিয়ে ধর্ম-বাণীর মোড়কে হাজির হয়েছে, আবার কখনো বোধ-বুদ্ধির পরিধির মধ্যে যুক্তি দিয়ে বোনা দার্শনিক প্রকল্প হিসেবে হাজির হয়েছে। মুসা (আ.) যে তাঁর সম্প্রদায়কে 'টেন কমান্ডমেন্ট' বা দশটি আদেশ এনে দিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য যে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা ছিল, সে বিষয়ে বোধ করি কেউই অমত করবেন না। আবার দার্শনিক সক্রেটিসের বরাত দিয়ে তাঁর শিষ্য প্লেটো যে কল্পিত সমাজের রূপরেখা আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটাও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই। আর এই ন্যায্য সমাজের আকর্ষণ এতই দুনির্বার যে প্লেটো থেকে শুরু করে মার্ক্স হয়ে হালের অমর্ত্য সেন পর্যন্ত সবাই ন্যায্যতার সূত্রটি আমাদের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেন। আর মানুষ রাজনীতি যে কারণেই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দোহাইটি দেয় ন্যায্যতার। সে জন্য লালনের রাজনীতি পাঠের শুরুটা তাঁর ন্যায্য সমাজের রূপরেখা দিয়ে শুরু হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক মানুষের দুটি পরিসর। প্রথমত, তাঁর ব্যক্তিগত পরিসর বা অন্দরমহল বা প্রাইভেট স্ফিয়ার, যা অন্য সবার কাছ থেকে সে সংরক্ষণ করতে চায়। অন্যটি হলো জনপরিসর, যেখানে সে অন্য সবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চায়। আর গণতান্ত্রিক সম্পর্কের রূপরেখা এই পরিসরেই মূর্ত হয়। যদিও অন্দরমহল রাজনীতিবর্জিত নয়, তারপরও আমরা ধরে নিই যে আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা জনপরিসরে বা পাবলিক স্ফিয়ারে রাজনীতি করবে। লালন কোনভাবে কোন পরিসরে কোন শর্তে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে চেয়েছিলেন, আমরা সেটা হেবারমাসের পাবলিক স্ফিয়ারের বরাত দিয়ে আলোচনা করব।

পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষ সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্য পরস্পরের সঙ্গে চুক্তি করেছে বলে পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে মনে করেন। অপশ্চিমা সমাজে কি এমন ধরনের কিছু ছিল? এই বাংলায় সামাজিক জীবন কোন নীতিতে চলবে, সে বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কোনো বোঝাপড়া ছিল না? বোঝাপড়ার কোনো চিহ্ন কি লালনের কালামে থাকতে পারে? যদি থাকে, সেটা আমাদের সামষ্টিক জীবনকে বুঝতে সাহায্য করবে। সেই জন্য আমরা লালনের কালামে সেই বোঝাপড়ার চিহ্নগুলো বিশ্লেষণ করব। সমাজের একক ব্যক্তি। ব্যক্তি কীভাবে অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, কীভাবে সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে—এ দুটি বিষয় রাজনীতির গুণগত মানের নির্ণায়ক। সে জন্য আমরা লালন কীভাবে ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার পরামর্শ দেন সেটি আলোচনা করব।

জাত-পাত-ধর্ম-গোত্র-রাষ্ট্র ইত্যাদির বিবেচনায় মানুষের যত পরিচয়, সেগুলো সবই কৃত্রিম বা মানুষের সৃষ্টি। পরিস্থিতি অনুযায়ী সুবিধামতো মানুষ বিভিন্ন পরিচয়ে নিজেদের ভূষিত করে। অন্যদিকে প্রকৃতি মানুষকে জৈবিকভাবেই নারী ও পুরুষ হিসেবে তৈরি করে। সেদিক থেকে এই পরিচয়কে প্রাকৃতিক বলা যেতে পারে। কিন্তু এই পরিচয়কে কেন্দ্র করে নারীর ওপর যে বৈষম্য ও নিপীড়ন, সেটি এ মুহূর্তে আমাদের যত্নের সঙ্গে বুঝতে ও মোকাবিলা করতে হবে। সেই বিবেচনায় আমরা লালনের কালামে নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে বয়ান রয়েছে, তা পাঠ করব। সবশেষে, লালনের রাজনীতির একটি রূপরেখা আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র

১. Adrian Leftwich, *What is Politics: The Activity and its Study*, Cambridge University Press, 2004, p. 12.

২. Adrian Leftwich, *op cit.*, p. 15.

৩. Adrian Leftwich, *op cit.*, p. 20.

৪. Hannah Ardndt, *On Violence*, Orlando: A Harvest/HBJ Book, 1969, p. 44.

৫. James Scott, *Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance*, New Jersey: Yale University Press, 2008.

৬. উদ্ধৃত, ফিরোজ এহতেশাম, সাধুকথা *: ১৩ বাউল-ফকিরের সাথে কথাবার্তা*, ঢাকা : মেঘ, ২০১৮, পৃ. ৬৮।

৭. আলথুসার বিষয়টিকে বলেন misrecognition of the self. বিস্তারিত দেখুন, Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*, Translated by G M Goshgarian, New York: Verson, 2014, pp. 171-207.

৮. Peter Goldberg and Jed Sekoff, Ideology and the Question of the Subject, *Canadian Journal of Political and Social Theory*, Vol. 4. No. 2, pp. 23-43.

৯. Louis Althusser, *op. cit.*, p. 183.

১০. Louis Althusser, *op. cit.*, p. 181.

১১. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, New York: Routledge, 2013 [1946].

পাবে সামান্যে কি তার দেখা : লালনের ন্যায্য সমাজ

সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ। তখন তিনি যে কাজগুলো করতেন, সেগুলো ন্যায্য নাকি অন্যায্য? কোনোটিই নয়। নিঃসঙ্গ সত্তার জন্য ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা কোনোটাই অর্থ বহন করে না। তিনি যখন সৃষ্টি করলেন, তখন সৃষ্টির সাপেক্ষে তাঁর ন্যায্যতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। ন্যায্যতা স্রষ্টার একটি আবশ্যক গুণ হিসেবে পরিচিতি পেল। একই কথা প্রযোজ্য আদি মানব আদমের ক্ষেত্রে। ধর্মের মিথ অনুযায়ী বাবা আদম যখন স্বর্গের বাগানে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁর যা খুশি করার স্বাধীনতা ছিল। ন্যায্যতা-অন্যায্যতার বালাই ছিল না। কিন্তু যখনই মা হাওয়া তাঁর সঙ্গী হলেন, তখনই তাঁদের মধ্যে ন্যায্য-অন্যায্য বোধ তৈরি হলো। ধারণা হিসেবে ন্যায্যতা অন্তর্গতভাবেই সামষ্টিক। প্রতিটি সমাজেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে ন্যায্যভাবে সম্পর্কিত থাকতে চায়। সেজন্য ন্যায্যতার আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন।

ন্যায্যতার আকাঙ্ক্ষা সবার মাঝে থাকলেও ন্যায্যতার তত্ত্বায়ন পশ্চিমেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে। পশ্চিমা রাষ্ট্রদর্শনের মূল বিন্দু হলো ন্যায্যতা। প্লেটো থেকে শুরু করে ইমানুয়েল কান্ট, এমনকি হালে জন রাউলস এবং অমর্ত্য সেনও প্রচার করেন যে ন্যায্যতাই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পশ্চিমা বিদ্যায়তনে এই ন্যায্যতার তত্ত্বায়ন বিচিত্রভাবে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এই প্রবন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো বাংলায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার কোনো রূপরেখা আছে কি না, আর যদি থাকে, তাহলে তাকে কোনো তত্ত্ব হিসেবে হাজির করা যাবে কি? সেই জিজ্ঞাসা থেকে আমরা লালনকে আশ্রয় করেছি। আমরা তাঁর কালাম থেকে ন্যায্যতার রূপটিকে চিত্রিত করতে চাই। লালনের কালামের প্রতি

'বিশ্বস্ত' থেকে আধুনিক বিদ্যায়তনিক কাঠামো বা একাডেমিতে লালন-চর্চার বৈধতা বিষয়ে দুটি বিষয় আগেই বলা দরকার। প্রথমত, যেহেতু পশ্চিমা ধারণাগুলোকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করে আমার (এবং আমাদের) 'জ্ঞানচর্চা'র শুরু, সেহেতু 'ন্যায্যতা' আলোচনার পাটাতনকে পশ্চিমা বলে অভিযোগ করার সুযোগ আছে। এটি উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তকদের বিচারে দোষণীয় বলে গণ্য হতে পারে। আমরা তাঁদের এই বলে সন্তুষ্ট করতে চাই যে আমাদের রাজনৈতিক ভাবনার অবয়বটা বুঝবার জন্য অন্য ঘরানার চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে আমাদের চিন্তার তুলনা দরকার। তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি পাটাতন জরুরি। আর এ মুহূর্তে আমাদের বাড়ির কাছের লালনকে বোঝা ও বোঝাবার জন্য আমরা পশ্চিমা পাটাতনকেই ব্যবহার করছি। কেননা, জাক দেরিদা যেমনটা বলেছেন, এ মুহূর্তে গ্রিকো-ইউরোপীয় প্রকল্পের ফলে যে মৌলিক চিন্তা-ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে, তা সমগ্র মানবতাকে ঘিরে ধরেছে... আর কোনো চিন্তা যদি একে পাল্টাতে চায়, তাহলে হয় এর মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, নয়তো দার্শনিক চিন্তার ভাষা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নিজের লয় ঘটাতে হবে।[১] আর উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার লক্ষ্যকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে কবুল করে আমরা যদি ইউরোপকেন্দ্রিকতাকে ঝেড়ে ফেলতেও চাই, তারপরও গ্রিকো-ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে দেশজ চিন্তার তুলনামূলক পর্যালোচনা জরুরি (এই বিবেচনায় পশ্চিমা কায়দাকানুন ও ভাষায় লালনের চর্চাকে কিছুটা কম নিন্দনীয় মনে হতে পারে)। সেই চেষ্টাটুকু আমরা এই অধ্যায়ে করেছি।

আমরা জানি, লালন সাধনার পথ বাতলে গেছেন এবং সেই সাধকদের মধ্যে 'ঘর' ও 'পর'-এর ভেদ রয়েছে (সে জন্য কিছু গুহ্য বিষয় আছে, যা তাঁরা কেবল সাধুসঙ্গেই আলোচনা করেন, অন্যত্র তা আলোচনা থেকে বিরত থাকেন)। সুনির্দিষ্ট সেই সাধনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গিয়ে যাঁরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে লালনকে বুঝতে চান, এক দিক থেকে তাঁদের 'পর' বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই সূত্রে আমি, এবং হয়তো আমরা সবাই, 'পর' পদবাচ্য। এখন 'পর' হয়ে লালনের কালাম পর্যালোচনা সিদ্ধ কি না, সেই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে প্রথম অধ্যায়ে। এখানে আমরা শুধু আগের অবস্থানই পুনর্ব্যক্ত করছি, 'আসলে প্রতিটি পাঠই নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করে এবং প্রতিটি যুগেরই নিজস্ব কিছু শর্ত আছে, যার পরিধির মধ্যে মৃত উচ্চারণগুলো অর্থময় হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে আমরা লালনের শিক্ষা

গ্রহণ করি যে প্রতিটি যুগেই কেউ না কেউ একজন রক্তমাংসের "গুরু" বা ব্যাখ্যাদানকারী থাকেন, তিনিই তাঁর যুগের ব্যাখ্যা সবার জন্য হাজির করেন, কিংবা তাঁর ব্যাখ্যাই সকলের কাছে সেই যুগের ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হয়। কোনো উচ্চারণেরই অপরিবর্তনীয়, অক্ষয় বা অব্যয় কোনো অর্থ নেই।'[২]

লালনের সামাজিক প্রেক্ষাপট

লালনের জন্ম পলাশী যুদ্ধের মাত্র পনেরো বছর পর। ১৭৭২ সালে। এর মাত্র তিন বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছে। এ সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে সুশীল চৌধুরী বলেন: নিঃসন্দেহে বাংলা ছিল স্বনির্ভর; কেবল রৌপ্য ছাড়া আর কোনো জিনিস আমদানি করা লাগত না এখানে।[৩] লালন দেহ রাখেন ১৮৯০ সালে। তত দিনে গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হয়েছে। লালনের সারাটি জীবন কেটেছে বিলাতি ঔপনিবেশিক শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপের মাঝে। বড় হতে হতে তিনি দেখেছেন বঙ্গের অর্থনীতিতে কীভাবে এবং কতটা ভাটার টান লেগেছে। বাংলার সাবসিস্ট্যান্স অর্থাৎ জীবন-যাপননির্ভর অর্থনীতি তো বটেই, শিল্প-বাণিজ্যও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল বিলাতি শাসনে। আঠারো শতক শেষ হতে না-হতেই দেশীয় মসলিন ও তাঁত শিল্পের বারোটা বেজে গিয়েছিল। সুশীল চৌধুরী লিখছেন: একটি সমৃদ্ধ জনপদ ভিনদেশি শাসনের ফলে কতটা অচিন্ত্যনীয়ভাবে ধসে যেতে পারে বাংলা তার একটি ধ্রুপদি উদাহরণ।[৪] আর সে সময়কার জমিদার-রায়তের শোষণমূলক সম্পর্কের ব্যাপারে কে না জানে? অর্থনীতির বাইরে সামাজিক জীবন সম্পর্কে বলা যায় যে তাঁর সমাজে অন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃধর্মীয় দুই ধরনের বিভেদই প্রকটভাবে ছিল। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিলাতি ঔপনিবেশিক শাসনের সরাসরি ফল; এর আগে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্ক চমৎকার ছিল, সেখানে কোনো প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো দূরের কথা, বিভেদও ছিল না। সি এ বেইলি দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু দেশীয় শাসকদের আমলেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে।[৫]

আর বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ ছিল তীব্র। এই ভেদ শুধু হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল

আশরাফ ও আতরাফ হিসেবে। ভারতে কর্মরত বিলাতি আমলা রিজলিকে উদ্ধৃত করে নিকোলাস ডার্কস লেখেন: মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যেও জাতিভেদের প্রভাব ছিল প্রকটভাবে দৃশ্যমান।[৬] নারীর অধস্তনতা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই ছিল। নারীকে তার সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকতে হতো। ফলে দেখা যাচ্ছে যে লালনের সমকালীন বাংলায় অসমতা ছিল বহুমাত্রিক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক। এই অসমতাগুলো আবার সমাজে পুনরুৎপাদিত হয়ে পরস্পরকে শক্তিশালী করত। এমন অন্যায্য ব্যবস্থার মোকাবিলার লালনীয় পন্থা কী, সেটাই আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব।

লালনের পদ্ধতি

লালনের ন্যায্য সমাজের রূপরেখার আলোচনায় যাবার আগে তাঁর পদ্ধতি নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা দরকার। প্রথমত, লালনের বিষয়ে প্রচলিত লেখাজোখায় তাঁকে মরমিবাদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমাদের জানা দরকার, তাঁর পদ্ধতি মরমি পদ্ধতি কি না? প্রথমেই আসা যাক, মরমিবাদ বা মিস্টিসিজম কী? যিনি মরমিবাদী, তিনি দুনিয়ার সমস্ত ঝকমারির মধ্যে একের বা একটিমাত্র কেন্দ্রের উপস্থিতি দেখেন; তিনি স্থান ও কালনিরপেক্ষ থাকেন; নিজের দেহ ও মনকে জয় করেন; প্রকৃতিকে একটি সাধারণ আইনের অন্তরঙ্গ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেন এবং সবশেষে নিজে সমস্ত ধর্মের ঊর্ধ্বে ওঠেন ও সর্বজনীন ধর্মে পৌছান। এরিক স্মিড্‌ট মরমিবাদকে উদার ধর্মপন্থীদের আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করেন।[৭] মরমিবাদ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সীমাবদ্ধতাকেই তার সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।[৮] অন্যদিকে লালন সাধনার যে বিবরণ আমাদের সামনে পেশ করেন, তাতে তাঁকে কখনো একজন অভিজ্ঞতাবাদী, আবার কখনো একজন কনস্ট্রাকশনিস্ট বা গঠনবাদী মনে হয়। লালন বলেন, 'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চে হয় নিত্যানন্দ/ যার অন্তরে সদা আনন্দ নিরানন্দ জানে না সে'।[৯] অর্থাৎ, যিনি জ্ঞানী তিনি সবসময় আনন্দধামেই বিরাজ করবেন। আর তাঁর জ্ঞান অর্জিত হয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি উপায়ে আহরিত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে। অতীন্দ্রিয়ভাবে বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া কোনো পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ সম্ভব কি না, সে প্রশ্নের জবাবও লালনের কাছে আছে, 'অদেখা ভজনা করা/

আঁধার ঘরে সর্প ধরা'। লালন কঠোরভাবে দাবি করেন: অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানলাভ করি। লালন মনে করেন ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মের দর্শন চর্চাও অভিজ্ঞতানির্ভর।

লালনের আদর্শ সমাজ

লালন তাঁর সামজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল: সমাজ যদি ধর্মে, বর্ণে, গোত্রে, শ্রেণিতে গভীরভাবে বিভক্ত হয়েই থাকে, তাহলে অন্য সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায় কী?[১০] লালনের ন্যায্যতার প্রকল্প তাঁর একটি গানে পরিষ্কারভাবে রূপায়িত হয়েছে:

এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান জাতি-গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর-আতরাফ বলি দূরে ঠেলে নাহি দেবে।
আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই সবার পাওনা পাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই ভবে কেহ নাহি পাবে।
ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতির তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির কে মোরে দেখাবে সেধে।[১১]

আদর্শ সমাজের বর্ণনা হিসেবে এ গানটিকে বাছাই করেছি আমরা। কারণ, কাঙ্ক্ষিত সমাজের বিবরণ এই গানে যতটা স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে আছে, তাঁর অন্য কোনো গানে এমনটা নেই। এবার, গানটির কনটেন্ট বা আধেয় বিশ্লেষণ করা যাক। এতে মোট বাক্য আছে আটটি। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ বাক্যটি আকাঙ্ক্ষাবাচক। বাকি ছয়টি বাক্যে আছে আদর্শ সমাজের বিবরণ। এর মধ্যে পাঁচটি নেতিবাচক বাক্য: ধর্মের বিভেদ থাকবে না, উঁচু-নীচু ভেদ থাকবে না, জাত-পাত থাকবে না, অপর বলে চিহ্নিত করে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না, উঁচু বিবেচনায় কেউ রেহাই বা পার পাবে না, এমনকি মানুষের পরিচয়-বৈচিত্র্যকে স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম বা উপায় হিসেবেও কেউ ব্যবহার করবে না। আর সদর্থক বাক্য হলো মাত্র একটি: আমির ফকির এক হয়ে ঠাঁই সবার পাওনা পাবে সবাই। দেখা যাচ্ছে যে, লালন ধর্ম, জাত-পাত-গোত্র ইত্যাদির নামে সমাজে বিদ্যমান অসমতা বা ইনইকুয়ালিটিকে দূর করার স্বপ্ন দেখছেন। আর 'আমির-ফকির এক হয়ে ঠাঁই সবার পাওনা পাবে সবাই' বলে তিনি

একটি নতুন বন্টন-ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছেন। মোদ্দা কথা, লালনের পরিকল্পের দুটি অংশ: প্রথমটি 'নেতি' দূরীকরণ এবং দ্বিতীয়টি 'ইতি'র বাস্তবায়ন।

নেতি দূরীকরণ

সমাজে বিরাজমান যেকোনো অসাম্য-বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে এর ঠিকুজি অনুসন্ধান। লালনের উপলব্ধি: বিরাজমান অসাম্যের উৎস হলো ধর্ম, গোত্র, জাতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/কাঠামো। আর এগুলোর বরাতে অসাম্য-বৈষম্য বৈধতা পায় ও টিকে থাকে। লালন কি তাহলে ধর্ম, জাতি, গোত্র এবং সামাজিক/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে খারিজ করে নতুন কোনো বিকল্পকে আমাদের সামনে হাজির করেন? অবাক করার বিষয়, লালন এসব কোনো কিছুকেই খারিজ করেননি। আবার, ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো এমনকি কোনো মতাদর্শকেও বিকল্প হিসেবে হাজির করেননি। ফলে, আমাদের সামনে প্রশ্ন দাঁড়ায় দুটি। প্রথমত, যে মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান অসাম্য-বৈষম্যের জন্য দায়ী, লালন সেগুলোকে খারিজ করেননি কেন? দ্বিতীয়ত, তিনি নতুন কোনো বিকল্পের প্রস্তাব করেননি কেন?

লালন কেন ধর্ম-জাতি-গোত্র বা অন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে খারিজ করেননি? সভ্যতার ইতিহাস হলো মানুষের যূথবদ্ধতার ইতিহাস। আপাতশক্তিহীন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি দৈবশক্তি অর্জন করে শুধু ঐক্যবদ্ধতার জোরে।[১১] ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখি মানুষ বিচিত্র নামে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে। সবাই মিলে স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের লালনও করে সবাই মিলে। আবার ব্যক্তিমানুষ নিজের শক্তিহীনতা ও অসহায়ত্বকে ভুলেও থাকতে চায় সবার মাঝে ডুব দিয়ে। আবার নিজেদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবার কৌশলও সবাই মিলে সৃষ্টিশীলভাবে আবিষ্কার করে। লালনের যুগে, কিংবা আজকেও, ধর্ম যতই শোষণ আর নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে হাজির থাকুক না কেন, সব ধর্মই তাদের আবির্ভাবের সময়ে স্ব স্ব সমাজের নিপীড়িত মানবতার জন্য মুক্তির সুবাতাস নিয়ে এসেছিল। প্রাচীন বা মধ্যযুগেই শুধু নয়, খোদ ঔপনিবেশিক আমলেও বাংলা অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে ধর্ম ছিল জরাক্লিষ্ট জীবনে নিত্যব্যবহার্য একটি দাওয়াই।[১২] সে জন্য কার্ল মার্ক্স বলেন: ধর্ম হলো নির্দয় দুনিয়ার দয়াল-চান,

আর প্রাণহীন জগতের প্রাণ (Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of the soulless conditions.)।[১৪] যাদের অন্তর্গত শক্তি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, ধর্ম তাদের আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদা হিসেবে হাজির থাকে। মানবসত্তা যেহেতু এখনো সত্যিকার রূপে কোথাও হাজির নেই, মানবসত্তার নির্যাসকে আমরা ধর্মের মধ্যেই পাই। ধর্ম শুধুমাত্র নিপীড়িত মানুষের জন্য নয়। এমিল ডুর্কহেইম জোর দিয়ে বলেন যে মানুষ যদি সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাদের হয় ধর্ম অবলম্বন করতে হবে, অথবা নিয়মিত এমন সব আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে যেগুলোকে ধর্মের মতোই মনে হবে।[১৫] আমাদের আজকের যুগের রাষ্ট্রীয় আচার আর ধর্মাচারের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যে রাষ্ট্রাচার বছরের পর বছর একইভাবে হয়ে আসছে, তার সঙ্গে ধর্মাচারের পার্থক্য তেমনটা নেই। হয়তো সেই কারণেই সহসা সেই আচার বদলে ফেলার বা বাতিল করার সাহসও কেউ করেন না। আমাদের জীবনে ধর্মের এমন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই হয়তো মোতাহের হোসেন চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন: শিক্ষিত লোকের ধর্ম হলো সংস্কৃতি, আর সাধারণ লোকের সংস্কৃতি হলো ধর্ম।[১৬] ধর্ম থেকে আমাদের মুক্তি নেই। ধর্ম সম্পর্কে যা বলা হলো, একই কথা প্রযোজ্য জাতি বা নেশন সম্পর্কে। হবসবম বলেন, কোনো এক পারমাণবিক যুদ্ধে মানবজাতির যদি বিলুপ্তি ঘটে, আর কোনো কারণে গত দুই শ বছরে যত বই লেখা হয়েছে, সেগুলো যদি টিকে যায়, আর সে বইগুলো যদি কোনো ভিনগ্রহের প্রাণী পড়তে পারে, তাহলে তারা যে ধারণা আমাদের সম্পর্কে নেবে সেটা হলো: মানব ইতিহাস আসলে জাতিসত্তা তৈরির ইতিহাস।[১৭] প্রকৃত প্রস্তাবে গত এক শ বছরে অ-ইউরোপীয় অঞ্চলের শোষণমুক্তির লড়াইয়ের গল্প আর জাতীয়তাবাদের গল্প একাকার হয়ে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে আমাদের মুক্তির পথ সুগম করেছে; অথচ সেই জিনিস আজ ব্যবহৃত হচ্ছে কাশ্মীরের মানুষদের কিংবা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলার জন্য।

এমনকি পরিবারের মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পরিবারের উদ্ভব পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা বিধানের জন্য। কিন্তু এই পরিবারও কখনো কখনো তার সদস্যদের হন্তারক হিসেবে

হাজির হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা 'অনার কিলিং' বা ইজ্জত বাঁচানোর জন্য খুনের কথা বলতে পারি। এখন এর প্রকোপ ভারত-পাকিস্তান, আফগানিস্তান-ইরান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শুধু নয়, পশ্চিম ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে। অনার কিলিং বিষয়ে নিকোল পোপ লেখেন : আমার বুঝতে সত্যিই কষ্ট হয়েছে যে একটি অলিখিত সামাজিক রীতির প্রতি নিষ্ঠা কতটা শক্তিশালী হতে পারে। এই রীতি কতটা শক্তিশালী হলে বাবা-মা যে সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে এসে অতি আদরে লালন-পালন করে বড় করেছেন, সেই সন্তানকেই আবার খুন করতে (বা করাতে) পারেন?[১৮] ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে পরিচয়গুলোকে আশ্রয় করে মানব-সমাজ-সভ্যতা এগিয়ে যায়, কালের আবর্তে ঠিক সেগুলো আশ্রয় করেই শোষণ-নির্যাতন-অসাম্য-বৈষম্য গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে। আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে মানুষের কল্যাণই সরকারের স্থায়ী লক্ষ্য, আর এই কল্যাণ সত্যিকারের সুশাসনের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব ('Everybody knew and said that the happiness of people had to be the permanent goal of governments, but then happiness was conceived as the result or the effect of a really good government.')।[১৯] কিন্তু এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, রবার্ট নজিক লেখেন : আমরা যে অসুখ সারাবার জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছি, রাষ্ট্র তার চাইতে বেশি অসুখ তৈরি করেছে।[২০] দুনিয়া কাঁপিয়ে দেওয়া বিপ্লবগুলোও তো এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের বা লিবার্টি, ইকুয়ালিটি ও ফ্রেটারনিটির মন্ত্রে দীক্ষিত ফরাসি বিপ্লবের নায়কেরা কত অল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর সহিংসতার মধ্যে পতিত হলেন, আমরা জানি। আবার মার্ক্স যে শোষণহীন দুনিয়ার স্বপ্ন সবাইকে দেখিয়ে গেছেন, লেনিন যুগ পেরিয়ে স্টালিন যুগে এসে সেটা পুরোপুরি একটি নিপীড়নের গল্পে পরিণত হয়েছে। এত কিছু দেখে দুর্মুখ মিশেল ফুকো মন্তব্য করেন : মানুষের ইতিহাস বলে, আমরা যতবারই সমসাময়িক ব্যবস্থাকে অতিক্রম করবার জন্য নতুন ব্যবস্থাকে, নতুন সংস্কৃতিকে, নতুন চিন্তা পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি, ততবারই সবচেয়ে বিপজ্জনক ও সনাতনী পদ্ধতিতে পতিত হয়েছি।[২১]

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং মতাদর্শেরও উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক রূপান্তর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে লালন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্মভেদী এক মন্তব্য করেন, 'ছা'য়ের জন্য আনিলাম আধার/ আধারে ছা খেল

এবার' (চৌধুরী, পৃ. ৫৬৩)। সে জন্য তিনি নতুন কোনো আধার আমাদের সামনে হাজির করেননি। লালনের গোটা কালাম তন্নতন্ন করে খুঁজে নতুন কোনো মতাদর্শ পাওয়া যাবে না। এমন কোনো বাক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রচলিত সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠানকে নাকচ বা খারিজ করেছেন। কোনো কিছুকেই খারিজ করেননি তিনি।

লালনের উপলব্ধি হলো

যে উদ্দেশ্যে সমাজের মানুষেরা নিজেদের কিছু নিয়মের অধীন করেছে, সেই উদ্দেশ্য এখন সবাই ভুলে গিয়ে নিয়মকেই সর্বোচ্চ স্থানে রাখছে। শাস্ত্র তৈরি হয়েছে মানুষের সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য; আর সেই শাস্ত্রকে আশ্রয় করেই কিছু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণের পথরোধ করছে। লালন বলেন : 'বেদী ভাই বেদ পড়ে সদাই/ আসলে গোলমাল বাধায়'।[২২] কিংবা 'বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাধবে তত লখনা (সন্দেহ)।[২৩] তাই লালন কোনো প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় না করেই তাঁর ন্যায্য সমাজের প্রকল্প হাজির করেছেন।

লালন যদি কোনো মতাদর্শই প্রস্তাব না করেন, কোনো নতুন কর্মসূচি হাজির না করেন, তাহলে কিসের বলে তিনি সমাজ বদলাতে চান? যে কারণে একসময়ের প্রগতিশীল ভাবাদর্শ প্রতিক্রিয়াশীলতায় পর্যবসিত হয়, যে কারণে একসময়ের সুখদায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো শোষণ ও নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত হয়, লালনের প্রকল্প হলো সেই 'কারণ' নির্মূলের প্রকল্প। তাহলে প্রশ্ন আসে : সেই কারণটি কী? তাঁর জবাব : মানুষ যখন থাকে 'চোখ থাকতে হয়ে কানা' (পৃ. ৪৬৬), 'জন্ম-অন্ধ মন গুণে' (চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ১১২), গোলে পড়ে (পৃ. ১৩৭), ঘোর-পথে ঘুরে (পৃ. ১৪৭) তখনই সমাজে অসাম্য-বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। যখন মানুষ 'ভেদ-বিধি-পথ-শাস্ত্র কানা' হয়, তখনই সেগুলো মানুষের ওপর চড়াও হয়ে বসে। তাই তিনি আফসোস করেন, 'আমার মনের ঘোর গেল না' (পৃ. ৬২০)। তাহলে উপায় কী? উপায় হলো, 'ঘুচাও আমার ঘোর অন্ধকার' (পৃ. ১৭১)।

'ঘোর' তাড়ানোর প্রকল্প

লালন মনে করেন, আগেই বলেছি, সব অসাম্য-বৈষম্যের কেন্দ্রে থাকে ঘোর। মানুষের এই ঘোর স্ব-আরোপিত। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পর্যালোচনাহীনভাবে

মেনে নেওয়া যখন স্বাভাবিকতায় ও অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন এই ঘোর তৈরি হয়। আর এই ঘোরের কারণেই মানুষের কল্যাণার্থে নির্মিত নিয়মরীতি ও প্রতিষ্ঠান মানুষের ওপর চড়াও হয়। আর তাই লালনের প্রকল্প হলো মানুষের স্ব-আরোপিত ঘোর বা অপরিপক্কতা থেকে উত্তরণের প্রকল্প। ১৭৮৪ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট'-এ ইমানুয়েল কান্ট একেই বলেছেন আলোকায়ন। কান্টের মতে, এই ঘোর প্রকৃতিপ্রদত্ত সক্ষমতাগুলো দীর্ঘ অব্যবহারের কারণে মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।[২৪] ঘোরাচ্ছন্ন মানুষ বাস্তবতাকে তার নিজস্ব রূপে বুঝতে পারে না। ঘোরাক্রান্ত মানুষ বাস্তবের ভুল পাঠ নেয়।

মাকাল ফলের রূপ দেখে সদাই যেমন নাচে কাকে
তেমনি মন মোর, চটকে বিভোর সার পদার্থ নাহি চেনে।
মন তোমার গুণ জানা গেল পিতল কিনে সোনা বল।[২৫]

ঘোর কাটাতে, কান্ট বলেন, সাধনার বিকল্প নেই।[২৬] লালনের দাওয়াইও একই। তিনি বলেন: কেবল সাধনার মাধ্যমেই প্রকৃত বাস্তবতাকে জানা যাবে এবং মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। তবে কান্টের সঙ্গে লালন একটি বিষয় যোগ করেন: সাধনা হতে হবে 'গুরু'র অধীনে গুরুতে লীন হয়ে। কিন্তু এই 'গুরু' কীভাবে চেনা যাবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। লালন বলেন: 'আমি সত্য না হলে গুরু সত্য কোন কালে'। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে একজন মানুষকে যোগ্যতাহীন মনে হতে পারে; কিন্তু লালন বলেন, সাধারণ বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্যিকারের গুরু চেনার সর্বনিম্ন সক্ষমতা তাঁর সহজাত, অনায়াসলব্ধ। গুরুতে দীক্ষা নিয়ে গুরুতে লীন হওয়ার যে পন্থা লালন প্রচার করেন, সেটা একজন ব্যক্তিকে গুরুর সাপেক্ষে ক্ষমতাহীন করে বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লালন এখানে সাধারণ মানুষের অন্তর্গত সক্ষমতাকে স্বীকার করার মাধ্যমে আমজনতাকে ক্ষমতায়িত করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের সংশয়বাদী ধারার দার্শনিক রেনে দেকার্তের কথাকে স্মরণ করতে পারি: I think, therefore I am. আমার স্বতন্ত্র ভাবনা আছে সে জন্য আমি অস্তিত্বশীল—রেনে দেকার্ত এমন দাবি করেছেন। আর লালনের দাবি হলো, আমি যতই মূর্খ হই না কেন, সহজাত বুদ্ধি প্রয়োগ করে গুরু চিনবার ক্ষমতা আমার রয়েছে। এতটুকু স্বীকারের মধ্য দিয়েই প্রাচ্যদেশীয় সমাজে লালন গণতন্ত্রায়ণের সম্ভাবনা তৈরি করেন।

গুরুর অধীনে চর্চা

লালন মানুষের অপার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। তবে চেষ্টা ও প্রশিক্ষণবিহীন মানবজমিন, যা আবাদ করে সোনা ফলানো সম্ভব, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পতিত থাকে। লালন আফসোস করেন : 'আপন ঘরে বোঝাই সোনা/ পরে করে লেনা দেনা/ আমি হলাম জন্মকানা/ না পাই দেখিতে' (চৌধুরী, পৃ : ৩৩২)। এ নিয়ে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য বুঝেশুনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুর আশ্রয় নিতে হবে। গুরু সেই সম্ভাবনা বিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবেন। 'রাজী হলে দারোয়ানী/ দ্বার ছাড়িয়ে দিবেন তিনি' (চৌধুরী, পৃ : ৩৩২)। গুরুর অধীনতা আসলে শিষ্যের স্ব-অধীনতা অর্জনের শর্ত। গুরুর অধীন হয়ে অহংকে বিসর্জন দিয়ে বোধ-বুদ্ধির বিকাশের পথ তৈরি হয়। অন্যাথায়, জীব অস্তিত্ব থেকে মানব অস্তিত্বে উত্তরণ সম্ভব নয়। লালন তাই বলেন : ভবরঙ্গে থাকি মজে/ ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে/ গুরু দয়া হবে কিসে...ত্যাজিয়ে রে সুধা রতন/ গরল খেয়ে ঘটাই মরণ/ মানি নে সাধুগুরুর বচন/ মূল হারায়ে শেষ হইরে ধন্দ' (চৌধুরী, পৃ : ৫৬২)।

সাধনার প্রকৃতি

লালনের সাধনায় গুরুর প্রতি ভক্তি গুরুত্বপূর্ণ। কাণ্ডজ্ঞান থেকে মনে হতে পারে যে গুরুর প্রতি অন্ধভক্তি সাধকের সাধনার পূর্বশর্ত। ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। সাধনা শুরু করার আগে সাধনার পথকে পরখ করে নেওয়ার ওপর লালন গুরুত্ব প্রদান করেন। গুরু নির্দেশিত সত্য মেনে নেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই সত্যে নিজে উপনীত হওয়াটা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। লালন বলেন : 'না জেনে উপাসনা/ আন্দাজি হয় কি সাধনা/ মিছে কেবল ঘুরে মরা/ গোলেমালে'।[২৭] তার মানে, আগে বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ করা জানতে হবে, তারপর প্রয়োগের প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত : কোনো অনুকরণ চলবে না। কারণ, 'দেখা-দেখি সাধিলে যোগ/ বিপদ ঘটবে বাড়িবে রোগ' (চৌধুরী, পৃ : ৫২৩)। তা ছাড়া, সাধনার জগতে প্রবেশের পূর্বে সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকাও জরুরি। ভাবশূন্য হইলে হৃদয়/ বেদ পড়িলে কী ফল হয়? (চৌধুরী, পৃ : ৫২১)

সাধনার পথ সহজসাধ্য নয়, বন্ধুর। সাধনা কীভাবে করতে হবে, সেটা বোঝাতে লালন বলী রাজা, দাতা কর্ণ, দৈত্য প্রহ্লাদ ও রামের ভাই লক্ষ্মণের

উদাহরণ দেন। পরিণতির কথা চিন্তা না করে তাঁরা সবাই আদর্শে অটল ছিলেন। লালন পরামর্শ দেন, সাধকও তাঁর সাধনার ব্যাপারে সে রকম হবেন :

একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে
উঠিস না রে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা ॥
যে করিল কালার চরণের আশা
জান না রে মন তার কি দুর্দশা
ভক্ত বলি রাজা ছিল, সর্বস্ব ধন নিল
বামুনরূপে প্রভু করে ছলনা ॥ ...
কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল
অতিথি রূপে তাহার সবংশে নাশিল
তবু কর্ণ অনুরাগী, না হইল শোগী
অতিথির মন করেন সান্ত্বনা ॥

লালন যুক্তি দেখান, যে ধন, জীবন ও যৌবনের জন্য মানুষ অস্থিরমতি থাকে, তার কোনোটিই অনিত্য নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ব্যাপারে মানুষের মূল্যায়নেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই যে বিষয়গুলো শুধু নীতির বিচারে গুরুত্বপূর্ণ, ফল বিচারে নয়, সেগুলোই সাধকের উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যদিও সাধক ফলের দিকে তাকিয়ে তাঁর সাধনা করবেন না, তারপরও সাধক যদি তাঁর সাধনা অব্যাহত রাখেন, তাহলে সে প্রচেষ্টা শেষ বিচারে শুভ ফল নিয়ে আসে। লালন বলেন, 'পার নিহেতু সাধনা করিতে/ যাও না ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে/ নিহেতু সাধক যারা/ জবান খাঁটি করণ খাড়া/ উপসর্গ কাটিয়ে তারা/ চলছে পথে।' (চৌধুরী, পৃ : ৪৫৯)। 'নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে/ যে থাকবে চরণ চেয়ে/ শ্রীরূপ এসে তারে লয়ে/ যাবে রূপের দ্বারায়।' (চৌধুরী, পৃ : ৫০৮)। এমন সাধনা অনেকেই সাধতে চান, কিন্তু নানান কারণে পিছিয়ে আসেন। তাঁদের সমস্যাকে লালন চিহ্নিত করেন এভাবে, 'যেতে চাও মক্কা/ যদি পাও ধাক্কা ফিরে দাঁড়াও তৎক্ষণা/ বল তাতে নাই কাশীধামে যাই/ করে সহজ বিবেচনা।... এক নিরিখ যার/ যেতে ভবপার সে তরী টাল খাবে না' (চৌধুরী, পৃ : ২৮৫)। অর্থাৎ সাধনা অনেকেই শুরু করেন, কিন্তু যখনই পথকে কঠিন মনে হয় সে পথ ছেড়ে আরও সহজ পথের খোঁজে নেমে পড়া অনেকের জন্য স্বাভাবিক; কিন্তু যিনি তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকবেন, তিনি বিভ্রান্ত হবেন না; লক্ষ্যে পৌছাবেন।

পথটা কী

পথ সোজা। 'নিষ্কামী নির্বিকার হলে/ জীয়ন্তে মরে যোগ সাধিলে/ তবে খাতায় উশুল মিলে' (চৌধুরী, পৃ: ৮০)। জীয়ন্তে মরা বিষয়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লালন এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেন :

ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল পোরা।
হাঁটতে মানা, আছে চরণ
মুখ আছে তার খাইতে বারণ
ফকির লালন কয়, এ যে কঠিন মরণ
তা কি পারবি তোরা।

পথটা হলো প্রাণপ্রিয়কে কোরবানি করার পথ। 'মরণের আগে মরা/ আপন প্রাণ কোরবানি করা/ প্রাণ অপেক্ষা সেই পিয়ারা/ সে ভেদ কি বোঝায় শরায়?/ সারিয়া আপনার জান/ আবেগেতে দাও বলিদান/ নবিজীর হাদিস ফরমান' (চৌধুরী, পৃ. ২২১)। যদি কাম বা প্রবৃত্তিকে বশে এনে অর্থাৎ জীবিত থেকেই মরে গিয়ে গুরুপদে মন নোঙর করা যায়, তাহলে আসল মানুষের রূপ প্রকাশিত হবে। সেই মানুষ কে? কান্টের ভাষায় রিজনেবল মানুষ। লালনের ভাষায় সহজ মানুষ। সহজ মানুষ হওয়ার শর্ত হলো কামের ঘরে কপাট মারা। 'আগে কপাট মার কামের ঘরে/ মানুষ ঝলক দেবে রূপ নিহারে' (চৌধুরী, পৃ: ৮৩)।

লালন বিশ্বাস করেন, কামের ঘরে কপাট মারলে মানুষের আসল রূপ দেখা যাবে। কান্টও তাঁর সঙ্গে একমত। লালন জানান, মানুষের মনরাজ্যের দুটি অংশ। 'এক রাজ্যে দুইজন রাজা/ কার হুকুমে গত হয় প্রজা'। আবার তিনি জানান :

মন আর তুমি মানুষ দুইজন
এই দু'জনাতেই প্রেমালাপন
কখন সুধার বরিষণ
কখন গরল পেয়ে যন্ত্রণা।।
মন আর তুমি একজন হলে
অনায়েসে অমূল্য মেলে
একজনাতে আর একজন এলে
হয় মুরশিদ রূপ প্রকাশনা।[২৮]

মনোরাজ্যের দুটি অংশ। প্রথমটি কাম, দ্বিতীয়টি বোধ-বুদ্ধি (বা কান্টের ভাষায় রিজন)। কাম ও বোধ-বুদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক যদি টানাপোড়েনের হয়, তাহলে জীবনে কখনো সুখ আবার কখনো দুঃখ বিরাজ করে। তবে ব্যক্তি যদি কামের ঘরে কপাট মেরে নিষ্কামী হতে পারে এবং তার বোধ-বুদ্ধি কাম বা ইনক্লাইনেশনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তার মধ্যেই মুর্শিদ বা অবতারের রূপ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যেই মুর্শিদের গুণ প্রকাশিত হবে। সাধনার পথ পাড়ি দিতে পারলে কলিযুগে মানুষই অবতার রূপে হাজির হন। তাই এ যুগে অন্য কোনো অবতারের দরকার হয় না। লালন বলেন, 'বেদ-পুরাণে কয় সমাচার/ কলিতে আর নাই অবতার' (চৌধুরী, পৃ: ৩১১)। কলিযুগে আছে শুধু শুদ্ধ বোধ-বুদ্ধির (বা রিজনের) প্রয়োগ।

সাধনার ফল

এটা ঠিক যে ফল অন্বেষণ সাধকের উদ্দেশ্য নয়। তারপরও লালন ফলের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। সাধনার ফলপ্রাপ্তিতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু ফল লাভের প্রত্যাশায় সাধনা কাম্য নয়। তবে মনে রাখা দরকার, ফলপ্রাপ্তি হলো সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি। যদি মানুষ বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সব সমস্যার সমাধান তাঁর দ্বারা সম্ভব। সামাজিক-রাজনৈতিক সব সমস্যার সহজ সমাধান সহজ মানুষের কাছে মিলবে। লালন বলেন :

ডানে বেদ বামে কোরান
মাঝখানে ফকিরের বয়ান
যাহার আছে দিব্যজ্ঞান সেহি দেখতে পায়।[২৯]

কোনো ব্যাপারে বেদ ও কোরআনের, অর্থাৎ প্রচলিত মতাদর্শগুলোর, প্রস্তাবিত সমাধান ভিন্ন ভিন্ন কিংবা পরস্পরবিরোধী হলে সহজ মানুষই সেখানে জুতসই সমাধান হাজির করতে সক্ষম। এর জন্য বিশেষ জ্ঞান জরুরি। আবার কখনো কখনো অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেসব ব্যাপারে শাস্ত্রের কোনো নির্দেশনা নাও থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রেও বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সমাধান হাজির করেন। লালন জানান, 'কেতাব-কোরানে না পাইলে/ দেল কোরানে সব পাবে' (চৌধুরী, পৃ: ৩৯৪)।

সীমাবদ্ধতা

ফ্রান্সিস বেকন বলেন, নলেজ ইজ পাওয়ার। মিশেল ফুকো দেখান, সে জ্ঞান কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে একটি ডিসকোর্স অন্যগুলোকে সরিয়ে দিয়ে 'জ্ঞান' হয়ে ওঠে। জ্ঞানমাত্রই যেখানে অসমতার সম্পর্ক তৈরি করে, আত্মজ্ঞান কি অসমতার সম্পর্ক তৈরি করে না? সক্রেটিস কি তাঁর *অ্যাপোলজি*তে সেই অসমতাকেই ফুটিয়ে তুলেননি? আবার, তিনি যখন আদর্শ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর সমপর্যায়ের লোকদের, যেমন এডিমেন্টাস, পলিমেকাস, থ্রসিমার্কাস যুক্তি দিয়ে দার্শনিক রাজার শাসনের উপযুক্ততা ব্যাখ্যা করছিলেন; কিন্তু বিষয়টি যখন সাধারণ মানুষকে বোঝানোর পর্যায়ে এল, তখন তিনি তাঁর প্রকল্প না মানলে ঈশ্বরের ক্রোধ সবার ওপর নেমে আসবে বলে ভয় দেখানোর প্রস্তাব দেন। এখন কে অস্বীকার করবেন যে সক্রেটিস তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না? আবার তত্ত্বজ্ঞানী সাধারণ মানুষের কল্যাণের দোহাই দিয়ে যেকোনো 'অপ'বয়ান সবার ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না সে নিশ্চয়তাও তো আমরা কোথাও পাই না। সে জন্যই সম্ভবত গণতন্ত্রের দার্শনিক রুশো সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে কী করবেন সে বিষয়ে বলেন, 'পিপল উইল বি ফোর্সড টু বি ফ্রি।' কিন্তু লালন যে আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন, সেই 'আত্মজ্ঞান' অসাম্য তৈরি করবে কি না, সে বিষয়ের কোনো আলোচনা আমরা তাঁর কালামে পাই না।

আবার সাধক সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নন। সমাজের সঙ্গে তার নিরন্তর মিথস্ক্রিয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। প্রশ্ন হলো, এই মিথস্ক্রিয়ার ফল কী দাঁড়াবে? ক্ষমতার অসম-সম্পর্ক তৈরি করা কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান কি সাধুর চিন্তার বা কর্মের প্রভাবে আরেকটু বেশি ন্যায়পরায়ণ হবে? সাধুর প্রচেষ্টা কি দৃশ্যমান কোনো ফল বয়ে আনতে পারবে? নাকি সমাজের দাপুটে প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপে সাধু চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন? লালন তাঁর কর্মের কী প্রভাব সমাজে তৈরি হলো, সে ব্যাপারে কম চিন্তিত। কারণ, তিনি ফল-অন্বেষী নন। মানুষ কামের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বোধ-বুদ্ধির আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, সেটাই লালনের চিন্তা। আত্মসচেতন হওয়া ও করা তাঁর উদ্দেশ্য। ফল সম্পর্কে লালন চিন্তিত নন।

লালনের সমাজের একক হলেন ব্যক্তি। তাই তাঁর প্রস্তাব হলো খোদ ব্যক্তির রূপান্তরের মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের প্রস্তাব। ব্যক্তির নিজের

রূপান্তরের উদ্দেশ্যে শুধু নিজের সার্বভৌম দেহের ওপর প্রযুক্ত যেকোনো প্রক্রিয়াকে ফুকো আত্মপ্রকৌশল বা স্বকৌশল হিসেবে অভিহিত করেন। ফুকোর মতে উৎপাদন প্রকৌশল, চিহ্ন প্রকৌশল, ক্ষমতা প্রকৌশল এবং আত্মপ্রকৌশল—এ চারটি প্রায় সব সময়ই পরস্পরকে প্রভাবিত করে। আর এ প্রকৌশলগুলো সাধারণত যুগপৎভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই এগুলো একে অন্যের থেকে বিযুক্ত থাকে। লালন আমাদের তাঁর ন্যায্য সমাজের রূপরেখায় অন্য কৌশলগুলোর সঙ্গে স্বকৌশলের সম্পর্ক কী, সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। আবার ব্যক্তি হিসেবে সাধকই প্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশলগুলোর সঙ্গে কোন ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকবেন, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চুপ। নিশ্চুপ ব্যক্তি ও তার ওপর প্রযুক্ত প্রকৌশলের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়েও।

এসব প্রশ্নে লালনের নিশ্চুপ অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কান্টের শরণ নিতে পারি। আগে যেমনটা বলেছি, কান্ট মানুষের দুটি দিক চিহ্নিত করেছেন: একটি রিজন বা বোধ-বুদ্ধি, অপরটি ইনক্লাইনেশন বা কাম (প্রবৃত্তি)। জীব হিসেবে মানুষের যত প্রয়োজন, তার সবকিছুই ইনক্লাইনেশন দ্বারা মেটে। ফলে এসব ক্ষেত্রে রিজনের প্রয়োগ একেবারেই বাহুল্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তাহলে রিজনের কাজ কী? রিজন আসলে ওই সব কাজ করবে যেগুলো রিজন নিজের জন্য স্থির করবে। আর এই স্থিরকরণ হবে অভিজ্ঞতা কিংবা বাস্তবতা নিরপেক্ষভাবে। ন্যায়নিষ্ঠ হতে চাইলে মানুষ কোনো ধরনের ফল প্রত্যাশা না করে কামের ওপর বোধ-বুদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ নিশ্চিত করে। কান্ট বলেন, রিজন যদি পারিপার্শ্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ আর সব অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে (অর্থাৎ প্রভাবিত না হয়ে) বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, সেটা হলো Autonomy, আর অন্য সব কাজ হলো Heteronomy। আর অটোনোমাস সিদ্ধান্ত ও কাজ ন্যায়-প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।[৩০] লক্ষণীয় যে লালনের প্রকল্পও গুরুর অধীনে সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তির অটোনমি অর্জনের প্রকল্প। এখন লালনের প্রকল্পের অধীনে ব্যক্তি যদি কান্ট বর্ণিত অটোনমি অর্জন করতে পারেন, তাহলে আমাদের সমাজের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক, যা এখনো অন্যায্য সামাজিক-রাজনৈতিক বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনকে টিকিয়ে রেখেছে, রূপান্তরে তিনি কি সক্ষম হবেন? লালন আশা করেন যে ব্যক্তি যদি অটোনমি অর্জন করেন, তাহলে সামাজিক রূপান্তর সম্ভব। তবে অর্জনের সে পথ কঠিন। কেননা, প্রচলিত রাজনৈতিক-সামাজিক আচারের প্রতি আনুগত্য মানুষের মজ্জাগত হয়ে

উঠেছে। এবং কেবল অল্প কিছু লোকই নিজেকে কর্ষণের মধ্য দিয়ে বোধ-বুদ্ধি অর্জনের সাহস করে (only a few, by cultivating their own minds, have succeeded in freeing themselves from immaturity and in continuing boldly on their way)।[৩১] কান্টের সঙ্গে লালনও একমত। নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে, জেন্তে মরে সাধনার মাধ্যমেই কেবল অটোনমি অর্জন সম্ভব। আর এটা যে সোজা কোনো ব্যাপার নয়, সে ব্যাপারে লালন নিজেও সচেতন।

উপসংহার

লালন তাঁর গানে এমন এক সমাজ নির্মাণের প্রকল্প হাজির করেছেন, যেখানে মানুষ শুধু তাঁর কর্মগুণেই পরিচিত হবে। জাত-পাত-ধর্ম-গোত্র-রাষ্ট্র-জাতীয়তা ইত্যাদির জিগির সে সমাজে কেউ তুলবে না। আর সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজবদ্ধ ব্যক্তিকে যে সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সে সাধনার বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। সে সাধনায় জবরদস্তির কোনো স্থান নেই। সাধনার ব্যাপারে আগে থেকে জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নিয়েই কেবল ব্যক্তি গুরুর অধীন হবেন। অটোনমি অর্জন করবেন। নিজেকে চিনবেন। তখন তিনি সামষ্টিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য যে বিপুলসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাদর্শ সমাজে হাজির থাকে, সেগুলোর দ্বারা বিচলিত হবেন না; বরং সে ভাবাদর্শগুলোকে ধারণ করে সৃজনশীলভাবে নতুন সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। আর বিদ্যমান মতাদর্শগুলো আজকের দিনের যেসব সমস্যার সমাধান হাজির করতে পারে না, সেগুলোর কার্যকর সমাধানও তিনি হাজির করতে সক্ষম। 'পুসিদার ভেদ জানতে পারলে/ নবুয়ত তার অমনি মেলে/ কেতাব-কোরানে না পাইলে/ দেল কোরানে সব পাবে'। এটা ঠিক যে লালন আমাদের ন্যায্যতার কোনো সাধারণ সূত্র দেননি (তাঁর শঙ্কা: হয়তো সেটাই পরবর্তীকালে মানুষের ওপর চেপে বসবে; মানুষ নয়, সেই সূত্রই প্রধান হয়ে উঠবে)। আমরা দেখি যে লালন সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে প্রকল্প হাজির করেছেন, সেটা একান্তভাবেই 'ব্যক্তিগত' সাধনার। তাঁর এ প্রকল্পকে প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সবাইকে 'দার্শনিক রাজা'র গুণে গুণান্বিত করার প্রকল্প বলা যেতে পারে। আবার, একে কান্টের আলোকায়নের প্রকল্পও বলা যেতে পারে। কেননা, কান্ট যেমন সমাজের সব স্তরে বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগকে আলোকায়ন বলে অভিহিত করেছেন, লালনও তেমনি সমাজবদ্ধ মানুষদের সহজ-স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগ করার সাহস দেখানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। অন্যদিক থেকে দেখলে লালন

ঔপনিবেশিক সমাজে থেকেও ফুকোর মতো উত্তরাধুনিক অবস্থানকে গ্রহণ করেছেন। ফুকো যেমন বয়ানের বহুত্ববাদিতাকে উৎসাহিত করেছেন, লালনও তেমনি বেদ, কোরআনসহ সব বয়ানকেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং একই সঙ্গে নতুন বয়ান তৈরির সম্ভাবনাও জারি রাখছেন। ফুকো এবং লালন উভয়ের মধ্যেই আমরা কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতি স্থায়ী বা শর্তহীন আনুগত্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করি। আর মতাদর্শের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য যদি কোনো সমাজে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেখানে অসাম্য-বৈষম্য-সৃষ্টিকারী কৃত্রিম সামাজিক নির্মাণগুলো সমাজে শিকড় গেড়ে বসতে পারে না। তখন ব্যক্তির সহজ মানুষ হিসেবে সমাজে হাজির থাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যক্তি তখন প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শের চাপে হারিয়ে যায় না। ফলে সমাজ হয়ে ওঠে ন্যায্য।

তথ্যসূত্র

১. Jacques Derrida, *Writing With Difference*, New York: Routledge, 1978, p. 101.
২. মজহার, ফরহাদ, *সাঁইজীর দৈন্য গান*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ৩৫।
৩. Sushil Chaudhury, *From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal*, New Delhi: Manohaar, 1995, p. 2
৪. Sushil Chaudhury, *op cit.*, p. 2-3.
৫. CA Bayly, The Pre-History of 'Colonialism'? Religious Conflict in India, 1770-1860. *Modern Asian Studies*, Vol. 19, No. 2, 1985, pp. 177-203.
৬. H H Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta: Secretariat Press, 1891, Quoted in Nicholas B Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*, New Jersey: Princeton University Press, 2011, pp. 211, 218.
৭. Leigh Eric Schmidt, The Making of Modern "Mysticism", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 71, No. 2, 2003, pp. 273-302.
৮. William Kingsland, *An Anthology of Mysticism and Mystical Philosophy*, London: Methuen & Co., 1927, pp. vi-vii.
৯. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ৪৭৫।
১০. ফরহাদ মজহার, *ভাবান্দোলন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. সতের।

১১. সুধীর চক্রবর্তী তাঁর *বাউল ফকির কথা* (কলকাতা : আনন্দ, ২০১২) গ্রন্থের ২৩ ও ২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় চারটি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে লালনের নামে এ গানটি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি আদৌ লালনের রচনা নয়। কারণ চারটি হলো : আঠারো ও উনিশ শতকে জাতিভাবনার বিস্তৃতি বেশি ছিল না, এই গানে যতটা অন্ত্যমিল আছে, লালনের গানে এতটা অন্ত্যমিল থাকে না, লালনের কোনো পদে লালন কখনো নিজেকে ফকির হিসেবে বলেননি এবং এই গানে সিরাজ সাঁইয়ের নাম নেই। চারটি যুক্তিই দুর্বল। প্রথমত, আঠারো শতকেই বাংলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ছিল; ইউরোপ থেকে আগত খ্রিষ্টান বণিকেরা বাংলায় তত দিনে জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। যাযাবর না হলেও বাউল সম্প্রদায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ান। সেদিক থেকে এই অঞ্চলের মানুষে-মানুষে যে বিভেদ ও বৈচিত্র্য তাঁদের চোখ এড়ানোর কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই পদে যতটা অন্ত্যমিল, লালনের জনপ্রিয় পদ 'মিলন হবে কত দিনে'তে অন্ত্যমিল আরও বেশি; তারপরও কেউ এ গান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তৃতীয়ত, লালন অনেক গানেই তাঁর অনুসারীরা যে 'ফকিরি' করে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থত, সিরাজ সাঁইয়ের দোহাই লালনের অনেক গানেই নেই; আর তাঁর নাম উল্লেখমাত্রই কোনো পদ লালনের হয়ে যায় না। মূলত, লালনের এ পদটি বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তী যে মত প্রকাশ করেছেন, তা যুক্তির বিচারে টেকে না। সে জন্য আমরা লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর মতকে গ্রহণ করি। আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর *লালনসমগ্র* গ্রন্থের (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯) ১৭৯ নম্বর পৃষ্ঠায় এ গানটিকে স্থান দিয়েছেন। আমরাও এই পদটিকে লালনের পদ হিসেবেই বিবেচনা করি।

১২. Hannah Arendt (1970), *On Violence*, New York: A Harvest/HBJ Book.

১৩. David Hardiman, *The Coming of the Devi, Adivasi Assertion in Western India*, Delhi, Oxford University Press, 1987.

১৪. Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, 1843.

১৫. Emile Durkheim, *Elementary Aspects of Religious Life*, London, 1915, pp. 418-425.

১৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬, পৃ. ১।

১৭. E J Hobsbawm, *Nation and Nationalism Since 1780: Program, Myth, Reality*, New York: Cambridge University Press, 2000, p. 1.

১৮. Nicole Pope, *Honor Killings in the Twenty-First Century*, New York: Palgrave Macmillan, 2012, p. ix.

১৯. Michel Foucault, *Technologies of the self: A Seminar with Michel Foucault*, Amherst: University of Massachusetts Press 1988, p.158.

২০. Robert Nozick, *Anarcy, State and Utopia*, Oxford: Blackwell, 1999, p. 11.

২১. Michel Foucault, What is Enlightenment? See also, Technologies of the Self, p. 10.

২২. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ৬১৬।

২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ : ১৯৮।

২৪. Kant, Immanuel (1784), What is Enlightenment? Konigsberg, Prussia, 30th September.

২৫. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ : ৩০১।

২৬. ইমানুয়েল কান্ট, প্রাগুক্ত।

২৭. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০।

২৮. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ : ৩১০।

২৯. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৩০. Kant, Immanuel, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*.

৩১. Kant, Immanuel, An Answer to the Question: "What is Enlightenment?"

পাবলিক স্ফিয়ার ও সাধুর বাজার : মুখোমুখি হেবারমাস ও লালন

পাবলিক স্ফিয়ার বা জনপরিসর[১] পুঁজিবাদী ইউরোপের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার একটি অনুষঙ্গ। এ বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনা অনেক। প্রবন্ধের প্রথম অংশে লোকায়তন সম্পর্কে য়ুর্গেন হেবারমাসের জনপরিসর ধারণাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে লালন সাঁইয়ের 'সাধুর বাজার' ধারণাটির আলোচনা। এরপর জনপরিসর এবং 'সাধুর বাজারে'র একটি তুলনামূলক আলোচনা হাজির করা হয়েছে। সবশেষে প্রস্তাব হলো : জনপরিসরের অনুরূপ একটি ধারণা ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে নির্মাণ করেছিল।

হেবারমাসের জনপরিসর

য়ুর্গেন হেবারমাসের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষ যখনই লোকসংগঠন তৈরির লক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ শুরু করে, সেই মুহূর্তেই জনপরিসর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সামাজিক জীবনের যে জায়গাটুকুতে জনমত[২] তৈরি হয় (বা হতে পারে) সেই জায়গাটুকুই জনপরিসর বা পাবলিক স্ফিয়ার।[৩] জনপরিসরে মানুষ যখন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, যেমন রাষ্ট্রের কার্যাবলি নিয়ে আগ্রহী হয় কিংবা এ-সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করে তখন তাকে বলে পলিটিক্যাল পাবলিক স্ফিয়ার বা রাজনৈতিক জনপরিসর। নিজেকে, নিজের স্বার্থকে নিয়ে মগ্ন থাকা মানুষের

স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও জনপরিসরে ব্যক্তির চিন্তা ও তৎপরতা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়। এখানকার চিন্তা ও তৎপরতা সাধারণ স্বার্থকে নিয়ে। এখানে যে কেউ অন্য কারও সঙ্গে একত্র হওয়ার, সংগঠন গড়ে তোলার, মতামত প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

জনপরিসরের মূল কর্তা বা এক্সিকিউটর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ হলেও তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রকে এই পরিসরের অংশ হিসেবে ধরা হয় না। একে রাখা হয় জনপরিসরের বাইরে। অর্থাৎ জনপরিসর থাকে ক্ষমতার বলয়ের বাইরে। চার্লস টেইলর মনে করেন, হেবারমাসের জনপরিসর ক্ষমতাবলয়ের বাইরে সমাজকে একমন করে, ক্ষমতার বাইরে যুক্তির বয়ান তৈরি করে।[৪] রাষ্ট্র ও লোকায়তন কখনো একটি আরেকটিকে স্পর্শ বা ওভারল্যাপ করে না। যদিও সমাজের মধ্যেই এ পরিসরটুকুর অবস্থান, তারপরও ধারণাগত দিক থেকে এটি সমাজ থেকে আলাদা। লোকায়তন সমাজও নয়, আবার রাষ্ট্রও নয়। এ পরিসর রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এখানে জনতা নিজেরা সংগঠিত হয় এবং জনমতের ধারক হয়ে ওঠে। হেবারমাসের মতে, আঠারো ও উনিশ শতকে যে সংগঠনগুলোর ওপর ভিত্তি করে জনপরিসর তৈরি হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতির দিক থেকে সাংস্কৃতিক। এদের উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর সমাজের আলোকায়ন। এগুলো তৈরি হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে; আর টিকে ছিল উদার সামাজিকতা, খোলামেলা আলোচনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতির ভিত্তিতে।[৫]

এটা পরিষ্কার যে আমরা রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্বের কথা বলি, সেটা আসলে জনগণেরই কর্তৃত্ব। জনগণের জন্য রাষ্ট্রের তথ্যভান্ডার খুলে দেবার দাবিটি অনিবার্যভাবেই গণতান্ত্রিক। হেবারমাস যুক্তি দেখান, রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চাকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকার যখন এই জনদাবির কাছে নতি স্বীকার করে তখন আমরা বুঝি যে জনপরিসর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। আর তখনই জনপরিসর ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় রাখতে সক্ষম হয়।[৬]

জনপরিসর, জনমত—এ ধারণাগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থ নিয়ে ইউরোপে হাজির হয়েছে আঠারো শতকে। ক্ষমতাচর্চার ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনার অধিকার আমজনতার সব সময় ছিল না। বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে এই অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। পরস্পরবিরোধী নানান ধরনের স্বার্থের টানাপোড়েনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের শিক্ষিত শ্রেণির লড়াইটা ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের তুলনায় জনমানুষের ক্ষমতার এবং স্বার্থের ভারসাম্য অর্জনের লড়াই।[৭] সমাজবদ্ধ বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বার্থের

এক বিশেষ বিন্যাসের ফলেই ক্ষমতাকাঠামোতে জনগণের তদারকির অধিকার সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বস্তুত, নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতার ফলে জনপরিসর তৈরি হয়। আর তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এটি ক্ষমতার চর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ শুরু করে।[৮]

জনপরিসরকে চার্লস টেইলর সাধারণ পরিসর বা কমন স্পেস বলেছেন। এখানে সমাজের সদস্যরা সামনাসামনি কিংবা প্রিন্ট বা মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক বা তড়িৎ ইত্যাদি মাধ্যমে মিলিত হন বলে ধরা হয়।[৯] সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমেই জনপরিসর তৈরি হয়। মানুষের বাস্তব ক্রিয়াশীলতার বাইরের অন্য কোনো বিষয় বা উপাদান কোনোভাবেই লোকায়তনের অংশ নয়, জনপরিসর তৈরির শর্তও নয়। জনপরিসর মহাজাগতিক বা ঐশী কোনো আদেশ নয়, মানব অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে আসা কোনো সামাজিক বিন্যাসের রূপরেখা বা মহাপরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীলও নয়। সমাজবদ্ধ মানুষ বাস্তব সময়ে যেভাবে বাস্তবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সেই বিষয়টিই জনপরিসরের ধারণাকে বৈপ্লবিকভাবে জাগতিক বা সেক্যুলার করে তোলে।[১০]

চার্লস টেইলরের মতে, জনপরিসর একটা আজব জিনিস বা স্ট্রেঞ্জ থিং। আজব এই কারণে যে এটা এমন কোনো বাস্তব স্থান নয়, যেখানে সবাই মুখোমুখি সাক্ষাৎ করতে পারে; বরং এটা এমন এক কাল্পনিক জগৎ, যেখানে সমাজের সদস্যরা বিচিত্র উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পৃক্ত হওয়ার অনুভূতি লাভ করেন। পরস্পরের সঙ্গে বিতর্ক ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁরা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমন বা একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেন (form a common mind)।[১১] বিতর্ক ও পর্যালোচনা-জাত মত স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিদীপ্ত বা এনলাইটেনড হয়। আর আমজনতার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হওয়া মতামতকে আমলে নেওয়া সরকারের জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

হেবারমাসের মতে, আঠারো শতকে ইউরোপের সুশীল সমাজ বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে জনপরিসরের উদ্ভব ও বিকাশ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই পরিসর কি কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছিল, নাকি হেবারমাস তৎকালীন সমাজকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি জুতসই ক্যাটাগরি বা বর্গ হিসেবে একে নির্মাণ করেছেন। এ বিষয়ে হেবারমাসের বক্তব্য অস্পষ্ট। তিনি যখন বলেন যে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে যুক্তি-তর্ক-পর্যালোচনার ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে এক বিশেষ চৈতন্য তৈরি

হয়,[১২] তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি জনপরিসরকে বাস্তবতা হিসেরেই দেখিয়েছেন।

কিন্তু মাইকেল সুজসন, মেরি রাইয়ান, কিথ মাইকেল বেকার প্রমুখের মতে ইউরোপের জনপরিসর ততটা বাস্তবভিত্তিক ছিল না। আসলে এটা একটা সৃষ্টিশীল ভাবাদর্শ বা নরমেটিভ আইডিয়াল ছিল।[১৩] আবার হেবারমাস যখন বলেন যে তিনি আঠারো শতক এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়া জনপরিসরের আদর্শ অবস্থাটি শনাক্ত বা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন[১৪], তখন আমরা বুঝি যে বাস্তবকে তত্ত্বায়নের চেয়ে তার কাছে মুখ্য ছিল একটি আদর্শায়িত অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, সেটা আবিষ্কার করা। আবার 'জনপরিসর' প্রপঞ্চটি নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি লেখেন: আমরা যদি কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার নিরিখে কোনো প্রপঞ্চকে দাঁড় করাতে চাই, তাহলে আমাদের সংশ্লিষ্ট সমাজের জটিল বাস্তবতার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা, সেগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে হবে।[১৫] জনপরিসর প্রপঞ্চটি নির্মাণের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে হেবারমাস বলেন, সমাজে কর্মবিভাজন রয়েছে। যে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কাঠামোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, সে সমাজকে সামগ্রিক ধারণা বা হলিস্টিক কনসেপ্ট দিয়ে বোঝা যাবে না।[১৬] তিনি ধরে নিয়েছেন যে, আঠারো ও উনিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে ক্রিটিক্যাল পাবলিসিটি বা পর্যালোচনামূলক প্রচারের বাহন হিসেবে অন্তর্গতভাবে গণতান্ত্রিক একটি স্বার্থগোষ্ঠী একটি বিশেষ পরিসরে ক্রিয়াশীল ছিল। এই পরিসরই ছিল অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় যোগাযোগের সবচাইতে সম্ভাব্য কেন্দ্র। এটি নিজেকে পুনরুৎপাদনে সক্ষম।[১৭] হেবারমাস অবশ্য আধিপত্যশীল জনপরিসরের (হেজিমনিক পাবলিক স্ফিয়ার) সঙ্গে প্রাকৃতজনের জনপরিসর (প্লেবিয়ান পাবলিক স্ফিয়ার) একই সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৮]

আমাদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে জনপরিসর ধারণাটি তিনি আঠারো শতকের ইউরোপীয় সমাজ থেকে গ্রহণ করেছেন বটে, তবে এর সঙ্গে তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে যোগ করে ধারণাটিকে একটি আদর্শায়িত অবস্থায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এই আদর্শায়িত জনপরিসর বাস্তবে বিরাজ করত কি না, সে বিষয়ে হেবারমাস সম্ভবত নিঃসন্দেহ ছিলেন না।

সেই দিন আর নেই

রেমন্ড উইলিয়ামস দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকে ইউরোপের জনপরিসর ছিল সাহিত্য ও যৌক্তিক পর্যালোচনায় আগ্রহী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের দখলে। আর এখন সেখানে চলে গণমাধ্যম ও গণসংস্কৃতির আধিপত্য।[১৯] হেবারমাস জনপরিসর তত্ত্ব প্রথম হাজির করেন গত শতকের ষাটের দশকে। এর প্রায় তিন দশক পর তিনি যখন এর মূল্যায়ন করতে বসেন, তখন স্বীকার করেন যে জনপরিসর তার আদি রূপে বেশি দিন হাজির ছিল না।

উদ্ভবের কিছুকাল পরই পর্যালোচনাপ্রবণ জনপরিসর আবার ব্যক্তিগত গণ্ডির ঘেরাটোপে ঢুকে নিছক সংস্কৃতিভোগী হয়ে ওঠে। এ রূপান্তরের জন্য কিছু পরিবর্তনকে দায়ী করা যায়। যেমন যে ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জনপরিসরের উন্মেষ, সেগুলো আর আগের মতো নেই। সামষ্টিক পর্যায়ে পুস্তক প্রকাশনা ও পঠন-পাঠনের রীতি বদলেছে। বদলেছে দৈনিক-সাপ্তাহিক কাগজের পাঠককুলও। ফলে আঠারো শতকের জনপরিসরের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তর নতুন ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের উত্থান, বিজ্ঞাপনের নতুন ধরনের প্রাসঙ্গিকতা তৈরি, তথ্যের সঙ্গে বিনোদনের এক অভূতপূর্ব মিশেল, জীবনের সব ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর কেন্দ্রীয়করণ, উদার সাংগঠনিক জীবন ধসে পড়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতাকে চোখে চোখে রাখার সক্ষমতা লোপ ইত্যাদির ফল।[২০]

জনপরিসরের চিরায়ত রূপ আর নেই। হেবারমাস নিজেই স্বীকার করেন যে জনপরিসর এখন আগে থেকেই ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত এবং কাঠামোবদ্ধ। ক্ষমতা এখন জনপরিসরে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে, নির্ধারণ করে কোন বিষয় কতটা সময় ধরে আলোচিত হবে। এখানে কে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে ব্যাপারে লড়াই তো আগে থেকেই ছিল; এখন আসল লড়াইটা হলো গোটা যোগাযোগপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। কেননা, মানুষের আচরণকে তো প্রাথমিকভাবে যোগাযোগপ্রবাহই প্রভাবিত করে। মজার বিষয় হলো ক্ষমতা যখন যোগাযোগের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন ক্ষমতাবানের অভিসন্ধি ও কৌশল দুটোই যতটা সম্ভব গোপন থাকে।[২১]

ওপরের আলোচনা থেকে লোকায়তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ক) এটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের বাস্তব পরিধির বাইরের এক আধা-বাস্তব

পরিসর; খ) এখানে নাগরিক হিসেবে সবার অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে, বিশেষ কোনো ক্ষমতাবান পক্ষ বা গোষ্ঠীর যেকোনো সদস্য এতে যুক্ত হতে পারবেন, কিন্তু তাঁর অংশগ্রহণটুকু সেই বিশেষ পক্ষের/গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বলে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দাবি করবে না। এখানে সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে সাধারণ মানুষেরা একমত হওয়ার চেষ্টা করবেন; গ) তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে; ঘ) এখানে যুক্তিশীলতার চর্চা হবে, তার মানে এই নয় যে এখানে কেউ কোনো অযৌক্তিক দাবি বা বিষয় হাজির করবেন না। যেহেতু বিতর্ক ও পর্যালোচনাই হলো এ পরিসরের মূল কাজ এবং যেহেতু এখানে কেউ কারও ওপর জবরদস্তির প্রয়োগ করতে পারবে না, সেই কারণে আশা করা হয় যে এখানে শেষ পর্যন্ত যে মতটি তৈরি হবে সেটি যুক্তিনির্ভরই হবে; ঙ) চরিত্রের দিক থেকে জনপরিসর সম্পূর্ণভাবে জাগতিক (সেক্যুলার)।

লালনের সাধুর বাজার

বাঙালিকে বাজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য। সাধারণভাবে বাজার বলতে আমরা এমন এক পরিসরকে বুঝি, যেখান থেকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা সেবা পাওয়া যায়। অর্থনীতিশাস্ত্রের বাজারেও কাল্পনিক বা বাস্তবের পরিসরের বিষয়টি যুক্ত। ফলে বাজার মানেই হলো নির্ধারিত একটি বাস্তব বা কাল্পনিক পরিসর। লালনের সময়কালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে বাজারের ধারণা কেমন ছিল? এ ব্যাপারে সুদীপ্ত সেন বলেন, ইংরেজ উপনিবেশ-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্যে গোটা দুনিয়া অর্থে 'বাজার' ছিল সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত রূপকগুলোর একটি।[২২]

ঔপনিবেশিক বাংলার বাজার সম্পর্কে রণজিৎ গুহ বলেন, নিম্নবর্গের মানুষেরা বাজারে আধিপত্যশীল শ্রেণি ও তাদের শাসন-শোষণ কাঠামোর সমালোচনা ও পর্যালোচনা করত। বাজার ছিল সব স্তরের মানুষের নিয়মিত মিলনক্ষেত্র। সেটা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই হোক, বিনিময়ের জন্য বা আমোদ-প্রমোদের জন্যই হোক। আর সে জন্যই ঔপনিবেশিক শাসকদের চিন্তায় বাজার সব সময়ই ছিল নিম্নবর্গের মানুষদের দ্বারা গুজব ও বিদ্রোহের বয়ান তৈরি করার উপযুক্ত ক্ষেত্র।[২৩]

আঠারো এবং উনিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থের যোগসূত্র ও সমন্বয় দুটোই এ বাজারে হতো। পরিসর হিসেবে বাজার ছিল সবকিছুর কেন্দ্রে। সুমিত সেনের মতে, ঔপনিবেশিক বাংলায়

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের জটিল যোগসূত্রগুলোর মধ্যে বাজার ছিল সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্ববহ।[২৪] এমনকি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানে, যেমন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে জাগতিক ক্ষমতা এবং বস্তুজগৎ বোঝানোর জন্য রূপকার্থে 'বাজার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫]

তা ছাড়া লালনের গান এবং সাহেবধনি ও কর্তাভজা গানেও চিত্রকল্প হিসেবে 'বাজার' বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। লালনসহ অন্যান্য বাউল আধিপত্যশীল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের কড়া সমালোচনা হিসেবে প্রতীকী অর্থে বাজার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা প্রভুত্বমূলক ও শোষণমূলক সম্পর্কের বিপরীতে বিকল্প হিসেবে 'সাধুর বাজার' বা 'প্রেমের বাজার'কে হাজির করেছেন। হগ আরবানের মতে, তাঁদের এ প্রস্তাবে একদিকে যেমন স্থান ও কালকে ছাড়িয়ে যাবার আকুতি আছে, তেমনি আছে শোষণমূলক দুনিয়াকে পাল্টে ফেলার প্রচেষ্টা।[২৬] আরবান বলেন, আধিপত্যশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যুগপৎ ক্রিয়াশীলতায় যে সনাতনী বাজার চালু ছিল, বাংলার ব্রাত্যজনদের চোখে সেটা ছিল দেউলিয়া এবং সেই হেতু পরিত্যাজ্য। তাই তাঁরা বিকল্প হিসেবে কখনো 'ভাবের বাজার' আবার কখনো 'সাধুর বাজার' প্রস্তাব করেছেন এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছেন।[২৭] আরবানের এ বক্তব্যের সঙ্গে শক্তিনাথ ঝাও একমত। তিনি বলেন, বাউলদের গানে বারবার হাট ও বাজারের উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চান, যেসব অভাগা ব্যবসায়ী জগতের বাজারে সবকিছু হারিয়ে বসে আছে, সাধুর বাজারই তাদের সর্বশেষ অবলম্বন।[২৮]

আসলে উপমা হিসেবে বাজার খুবই দাপুটে। বাউলেরা এটাকে দুধারী তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলে নর-নারীরা কী ভীষণ দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে—এই বাজার স্পষ্টই প্রকাশ করেছে। এর বিপরীতে ব্রাত্যজনেরা তাদের স্বপ্নের 'প্রেম-বাজার' বা 'সাধুর বাজার' কে হাজির করে; এই বাজার তাদের সব রকম শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা থেকে মুক্তির সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখে।[২৯] ব্রাত্যজনদের কাছে সাধারণ বাজার হলো প্রকৃতিগত ও আচরণগত দিক থেকে চাতুরীময় কিংবা বড়জোর মোহময়; অন্যদিকে সাধুর বাজার প্রেমময়।

'সাধুর বাজার' আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কেননা, 'সাধুর বাজার ... আনন্দময়'।[৩০] লালন তাই 'সাধুর বাজারের' অভিজ্ঞতাকে বিরামহীনভাবে আস্বাদ করতে চান, 'আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে/ না জানি কোন্ সময় কী দশা হয় আমারে।'[৩১]

লালনের 'সাধুর বাজার' এক বিশেষ পরিসর। সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যখন শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তখন সেগুলোকে একযোগে মোকাবিলা করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। সব চ্যালেঞ্জকে সামনাসামনি মোকাবিলা করার পরিবর্তে তাঁরা এমন এক আদর্শ পরিসর তৈরি করেছেন, যেখানে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান অনুপস্থিত; যাতে করে সমস্ত বঞ্চনাকে এড়ানো যায়। নিপীড়ক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মোকাবিলা করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল এড়ানো।[৩২] এ বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তীর মত হলো: 'কল্যাণীর রামশরণ পাল, কুষ্টিয়ার লালন শাহ, হুদোর চরণ পাল, ভাগা গ্রামের খুশি বিশ্বাস, মেহেরপুরের বলরাম হাড়ি—এঁরা সবাই উচ্চবর্ণের ভ্রূকুটির বাইরে সাধারণ ব্রাত্যজনের বাঁচাবার জন্য একটা জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিছক প্রতিবাদ নয়, টিকে থাকাও। সংকীর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বাঁচা নয়, উদার মানবতা নিয়ে সহজ করে বাঁচা।'[৩৩] এমন আকাঙ্ক্ষিত জায়গা কীভাবে অর্জিত হবে? লালন আমাদের জানাচ্ছেন, 'সাধুর বাজার' সাধারণভাবে তৈরি হয় না। এ জন্য শর্তপূরণ জরুরি। কী কী শর্তে সে পরিসর তৈরি হয়, সে ব্যাপারে আমরা এখন আলোচনা করব এবং সে বাজারের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

সাধুর বাজারের কাজটা কী? কিংবা সাধুর বাজারে গেলে কী হয়? এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে লালনের স্পষ্ট জবাব, 'সাধুর বাজার কী আনন্দময়/ সেথায় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়/ কত ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ সৃষ্টি হয় / ভব-বন্ধন-জ্বালা যায় গো দূরে'।[৩৪] লালনের সমাজে ব্রাত্যজনদের জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর শোষণ-পীড়ন। সাধুর বাজারে সব রকম বন্ধনজনিত যন্ত্রণা দূরীভূত হবে বলে লালন আমাদের জানাচ্ছেন। এ বাজার সবার জন্য উন্মুক্ত। সাধুর বাজারের আনন্দে যে কেউ ভাগ বসাতে পারে। এতে সবার জন্য রসাস্বাদনের সমান সুযোগ থাকে। নিম্নবর্গের মানুষদের এক 'সাধুর বাজারে'র বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈক পত্রদাতা ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ১৮ চৈত্র *সংবাদ প্রভাকর*-এ লেখেন, 'যেহেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন প্রভৃতি জাতি

নীচেদের অন্নবিচার না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধিক্ষণ মাত্র কাহাকেও অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছিল, বোধহয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে ...'।

সাধুর বাজারে কী হবে? সেখানে সাধুসঙ্গ লাভ হবে। আর সাধুসঙ্গের ফলে ভব-বন্ধন-জ্বালা দূর হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হবে? না, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছুই হবে না। এর জন্য প্রথমে দরকার জ্ঞান। অনুমান করে বা অনুকরণ-অনুসরণ করে সাধুর হাট থেকে সুফল পাওয়া যাবে না। সুফল পাওয়া যাবে একমাত্র জেনে-শুনে সাধুর বাজারে অংশগ্রহণ করলে। লালন বলেন, 'সাধুসঙ্গ কর তত্ত্ব জেনে/ সাধন হবে না অনুমানে'।[৩৫] কীভাবে জানতে হবে, সে বিষয়ে এক সাধু বলেন, 'মনে মনে জানা, ধ্যানে জ্ঞানে জানা, এবারে তাকে দেহ দিয়ে কায়েম করা, সেটাই আসল। যেমন ধারা আপনি শুনলেন, গাছে সুন্দর ফল পেকেচে। শুনলেই তো হবে না। দেখতে হবে, খুঁজতে হবে, গাছে উঠতে হবে এবং সবশেষে খেতে হবে। তবে সাঙ্গ হল।'[৩৬] অর্থাৎ প্রথমে বুঝতে হবে এবং প্রতিদিনকার চর্চায় সেই জানা-বোঝার প্রতিফলন থাকতে হবে।

সাধুর বাজার যুক্তিশীল। সাধুর বাজারে যুক্তিশীলতা চর্চার বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তী এক চমৎকার দিক তুলে ধরেছেন, 'এঁরা আমাদের মতো কথায় কথায় শাস্ত্র দেখায় না। এঁদের আছে এক নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৌলানা বা উলেমা সে জগৎ বানাননি। এঁরা নিজেরাই দিনে দিনে বানিয়েছেন। তাতে আছে জৈবনিক দৃঢ় কাঠামো। কাম আর স্খলন তাতে একইভাবে স্বীকৃত ও ধিক্কৃত। প্রেম মহিমাময়। লোকধর্মের তত্ত্বে আবেগের চেয়ে লজিক বেশি, কারণ এ ধর্মে যারা আছে, তাদের অনবরত যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের মতামত পোক্ত করতে হয়। এ ধর্মে যাদের ছিনিয়ে আনা হয়, তাদের বোঝাতে হয় যুক্তিতর্ক দিয়ে। গ্রামের লোকে ভাষণে বড় একটা মজে না কিন্তু যুক্তিতে ভেজে। তাদের জীবন যে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা।'[৩৭]

সাধুর হাটে/বাজারে অংশগ্রহণ করাকে লালন 'ব্যাপার' (সাধারণভাবে ব্যাপারীগিরি থেকে 'ব্যাপার' শব্দটি এসেছে) করা বলছেন। সাধুর হাটে যাবার ফল হলো: জীবনকে আর নিরর্থক মনে হবে না। লালন বলেন, 'সাধুসঙ্গ কর রে মন/ অনর্থ হবে বিবর্তন'।[৩৮] অর্থহীনতা থেকে অর্থময়তার

দিকে যাত্রার জন্য সাধুর বাজার। আর অনর্থ বা অর্থহীনতা থেকে অর্থময়তার জন্য দুটি শর্ত পূরণ জরুরি। প্রথমটি জ্ঞান অর্জন এবং দ্বিতীয়টি হলো ইন্দ্রিয় দমন। আর এ দুটো কাজই সাধুর বাজারে সম্ভব। কেননা, লালনের মতে : ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় দমন/ হবে রে সঙ্গগুণে।[৩৯] কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই 'ব্যাপার' করাটা হয়ে ওঠে না। লালন বলেন, 'তোর ব্যাপার করা যেমন তেমন/ আসলে খাদ লাগালি'।[৪০] সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে কেন এমনটা ঘটে? এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন :

সাধুর হাটে সে যদি যায়
আঁট বসে না কোন কথায়
মন থাকে না তার দরগা তলায়
বুদ্ধি তার পেঁচোয় পেয়েছে।[৪১]

সাধুর হাট থেকে সুফল অর্জন সম্ভব, যদি সাধুর 'কথায় আঁট বসে'। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি নীতির অনুগামী হন, মন-মনন এবং বুদ্ধি যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবিষ্ট করেন, তাহলে সুফল আসবে।

সাধুর বাজার সম্পর্কে শক্তিনাথ ঝার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। প্রথমত, সাধু সভা বাউলদের মিলন সভা। সাধারণত, কেউ নতুন ঘর করলে অথবা কোনো শুভ সংবাদ উপলক্ষে, যেমন নতুন ধান উঠলে বা বাড়ির কেউ দীক্ষা নিলে বা রোগমুক্ত বা বিপদমুক্ত হলে বা বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এখানে পরিচিতজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়, অপরিচিতের সঙ্গে হয় পরিচয় ও যোগাযোগ। দ্বিতীয়ত, বাউল সম্প্রদায়ের সদস্য তো বটেই, অন্য মত-পথের মানুষও এখানে সমানভাবে আদৃত। নিমন্ত্রিত পরিবার থেকে একজনও সাধু সভায় না এলে নিমন্ত্রণকর্তা নিজেকে অসম্মানিত মনে করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সঙ্গে করে অন্য যে কাউকে নিয়ে আসতে পারেন। তৃতীয়ত, যে কেউ যেকোনো মতের লোককে সাধু সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। সরাসরি আমন্ত্রিত না হলে সাধু সভায় যাওয়া অপমানজনক নয়। বরং এমন খবর পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশকেই সাধু-সভায় অদ্ভুত আচরণ বলে বিবেচনা করা হয়। চতুর্থত, সাধু সভায় ধর্মে-বর্ণে-গোত্রে বা জাতিতে কোনো ভেদ নেই; ধনী বড়লোকের পার্থক্যও নেই। কোনো বিশেষ খাবার এককভাবে কাউকে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একই ধরনের খাবার দেওয়া হয়। এমনকি সম্মানের বেলায়ও প্রত্যেকে সমান। পঞ্চমত, সাধু সভায় বাউল সমাজের বিভিন্ন

ধরনের সমস্যা ও সংকট নিয়ে আলোচনা হয়, কখনো কখনো বিচারও হয়; আবার সভা শেষে আগ্রহী ভক্তকে দীক্ষাও দেওয়া হয়। এ ধরনের বিচার বা আলোচনায় যেকোনো অংশগ্রহণকারী মতপ্রকাশের অধিকারী; তবে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অন্যদের মানতে হয়। ষষ্ঠত, মেয়েরা সাধু সভায় অংশগ্রহণ তো করতে পারেই, নারী সাধুরা দীক্ষাও দিতে পারেন। সাধু সভার খরচ একক বা যৌথভাবে বহন করা হয়।[৪২]

ওপরের আলোচনা থেকে 'সাধুর বাজারে'র কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়:

ক) এতে সকলে আওনা-যাওনা (বা আসা-যাওয়া) করতে পারে। অর্থাৎ এতে প্রবেশ বা অংশগ্রহণ উন্মুক্ত।

খ) এই পরিসরে দেব-দেবতা বা অন্য কোনো অতিমানবীয় কর্তার কোনো ভূমিকা নেই। মানুষই সব। মানুষই গুরু। মানুষই শিষ্য। সুফল-কুফল সব কিছুর জন্য মানুষই দায়ী। অন্য কারও এতে দায় বা ভূমিকা নেই।

গ) এ পরিসরের লক্ষ্য হলো পারস্পরিক লাভালাভ। লালন বলেন: 'ব্যাপারে লাভ করলে ভালো'। ব্যক্তি যদি এ পরিসর থেকে 'ব্যাপার' করতে চায়, তাহলে তাকে লক্ষ্যে স্থির ও নীতিতে অটল থাকতে হবে। এখানে বেশির ভাগের 'মন থাকে না দরগা তলায়' বলে লালন অনুযোগ করছেন।

ঘ) জানতে হবে। পরে মানতে হবে। ক্রিয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু জেনেবুঝে ক্রিয়া করলেই কেবল সুফল ফলে, জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে। লালন বলেন: 'সাধুসঙ্গ কর তত্ত্বগুণে'।

লোকায়তন ও সাধুর হাটের তুলনা

আমরা জানি, ধারণা হিসেবে জনপরিসর তৈরি হয়েছে আঠারো শতকের শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপে। শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের পরস্পর আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবেই এটি বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে 'সাধুর বাজার' বাংলার শিক্ষিত সমাজের কাছে নিতান্ত অপরিচিত একটি প্রপঞ্চ। কৃষিনির্ভর বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এই ধারণার জন্ম (কিন্তু বিকাশ নয়)। ইউরোপের সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বার্থের লড়াইয়ের বিশেষ পর্যায়ে যখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হচ্ছিল, সেই প্রেক্ষাপটে জনপরিসর তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এ দেশে যাদের মাঝে 'সাধুর বাজার' জন্ম নিয়েছে, তারা ঔপনিবেশিক শাসন-

শোষণের অধীন; সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিন্দা-ঘৃণা ও আক্রমণের শিকার। ধর্মগুলোও একই সঙ্গে আফিম ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে হাজির ছিল।

সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরের একপর্যায়ে জনপরিসরের সৃষ্টি। অবশ্য হেবারমাস স্বীকার করেছেন যে তারপর অনেক সময় পার হয়েছে, অনেক কিছু বদলেছে, সঙ্গে লোকায়তনেরও কিছু কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে। অন্যদিকে আঠারো ও উনিশ শতকের কৃষিনির্ভর বাংলার গণ্ডগ্রামে যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য আলাদা পরিসর সৃষ্টি করেছে 'দুদণ্ড শান্তির জন্য', সেই পরিসরটুকুর সঙ্গে ভদ্র-সমাজের দূরত্ব ছিল বিস্তর; ক্ষমতাকাঠামোর যে অংশগুলো ন্যায্যতা বিলি করত, সেগুলোর সঙ্গে তাদের দূরত্ব ছিল আরও বহুগুণ। বলা যায়, তাঁরা এসব কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের আঁচ থেকে বাঁচানোর জন্যই তাঁদের চিন্তাগুলোকে নিজেদের পরিচিত—এবং একই সঙ্গে শিক্ষিতজনের অপরিচিত—মোড়কে হাজির করেছেন।

ইউরোপে বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যখন নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ক্ষমতাকাঠামোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে ক্ষমতাকে তাদের কাছে জবাবদিহি করার পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে, তখনই জনপরিসর তৈরি হয়েছে। দিনের শেষে এটাকে স্বার্থের টানাপোড়েনের ফল হিসেবে হেবারমাস দেখিয়েছেন। এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যুক্তি ও পর্যালোচনার ধারক হিসেবে নিজেদের প্রাধান্য (হেজিমনি) জাহির করতে পেরেছে এবং ক্ষমতাকাঠামোর স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছে। আর বাংলার 'সাধুর বাজার' তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ফলে ইউরোপের অভিজ্ঞতাকে যদি শুধু আলোচনার জন্যই 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নিই, তাহলে বাংলার বাউল জনগোষ্ঠী কমপক্ষে তিন গুণ অধস্তনতার মধ্যে ছিলেন। প্রথমটি ইউরোপীয় উপনিবেশের, দ্বিতীয়টি স্থানীয় জমিদার-সামন্ত শ্রেণির এবং তৃতীয়টি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবাদিতার (কখনো সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার কখনো আচারসর্বস্ব ইসলাম)। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতার কেন্দ্রটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, সে ব্যাপারে বেশির ভাগ সদস্যের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। স্থানীয়ভাবে জমিদার ও ভূমি-সামন্তদের বিরোধিতার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আপস করেই চলতে হয়েছে প্রান্তিক মানুষদের। আবার জমিদার-সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর ক্ষেত্রেও সেই ঔপনিবেশিক কাঠামোই ভরসা। এমন নানান

ধরনের দোলাচলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা আর ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে বোঝাপড়া করার বা সেটাকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্যম দেখাতে পারেননি। আর তাই সবার থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের মতো করে একটি পরিসর তৈরি করে তার মধ্যেই সুখ খুঁজে নিতে চেয়েছেন বাংলার বাউল, বিশেষ করে লালন ও তাঁর শিষ্যরা।

ইউরোপের লোকায়তন যেমন স্বার্থের টানাপোড়েনের ফল, বাংলার 'সাধুর বাজার'কেও তেমনি স্বার্থের টানাপোড়েনের ফল বলা যায়। প্রথমটি হলো মোকাবিলা করে আধিপত্যশীল বা হেজিমনিক হওয়ার ফল; আর দ্বিতীয়টি হলো মোকাবিলা করে আধিপত্যশীল হতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাকাঠামো থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফল। কিন্তু এ জন্য লালনের বা তাঁর অনুসারীদের কারও প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই। নিজেরা তাঁদের এ আপাত-ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি স্বীকার করে নেন। লালন বলেন, 'কার দোষ দিব এ ভুবনে/ হীন হয়েছি ভজনগুণে'।[৪৩] এর মধ্য দিয়ে নিজেকে অর্থাৎ নিজের চিন্তা ও কর্মকে ব্যক্তি ও সমাজের যা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত, তার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। যা কিছু অর্জন বা অনার্জন সবই আমাদের কর্মগুণে। চার্লস টেইলর পাবলিক স্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সেক্যুলারিটির কথা বলেছেন। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিও নেই। এতে নিজে যে পরিবর্তনের নায়ক বা কর্তা, সে বিষয়টাই প্রচ্ছন্নভাবে বলা হচ্ছে। কোনো ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব বা অন্য কেউ পরিবর্তন নিয়ে আসবে না। যা করার ব্যক্তিরই করতে হবে।

আবার সাধুর বাজারে উঁচু-নিচু ভেদ নেই। এ কথা সত্য যে, সাধুর বাজারে গুরু অন্ধকার বিদীর্ণকারী হিসেবে হাজির থাকেন। গুরুর স্থান সব সময়ই উচ্চে। তার ফলে কি সেখানে কোনো স্তরায়ন তৈরি হয় না? লালন জবাব দেবেন—হয় না। কেননা, গুরু সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন দীনভাবে। গুরু নিজেই সেখানে 'অবোধ', 'দীনহীন', 'অধীন', 'অপার', 'চটামারা' (চটকবাজ), 'ফেরে পড়া'-ভাবে হাজির থাকেন।[৪৪] সেখানে 'মানবীয় আমিত্ব বিনাশ করে..."আমি ও আমার"—এ ক্ষুদ্র ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষা' দেন লালন।[৪৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সাধুর বাজারে গুরু বিশেষ অর্থে এবং শিষ্য সাধারণ অর্থে 'হীন' হয়ে বিরাজ করেন। ফলে একধরনের সমতা সেখানে তৈরি হয়। এ সমতা দাস্যভাবে গণপরিমণ্ডলে হাজির থাকার সক্ষমতার সমতা। এ সমতা অন্যের কাছ থেকে অধিকার

পাওয়ার সমতা নয়, বরং 'অপরের' অধিকারের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা। অন্যদিকে ইউরোপীয় লোকায়তনেও সমতার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু সে সমতার ভিত্তিভূমিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে অন্যের স্বার্থের সাপেক্ষে নিজেরটাকে প্রতিষ্ঠা করার তাড়না থেকে একধরনের 'সমতা' তৈরি হয়। সবাই যখন নিজেরটা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন সবাই মিলে আপসরফা করে এবং একধরনের সমতা তৈরি হয়। আর এ সমতার ভিত্তিভূমি হলো নিজের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জবরদস্তি বা জোর খাটানোর সক্ষমতা।

জনপরিসরে সবাই সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। আর এর পূর্বশর্ত হলো অবাধ তথ্যের প্রবাহ (হেবারমাস যাকে প্রিন্সিপল অব পাবলিক ইনফরমেশন বলেন)। ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যক্তির অনুমোদন পেয়ে জন্ম নেয় বটে, কিন্তু পরিপুষ্ট হয় জবরদস্তির সব হাতিয়ার নিজের একচ্ছত্র অধিকারে রেখে। ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান পক্ষ তথ্য জোগাড় করে এবং সেগুলোর মাধ্যমে আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাধারণ জনতা প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হতে থাকে। এমতাবস্থায় ক্ষমতাবানের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য পূর্বশর্ত। তথ্যের ঘাটতি থাকলে জনপরিসরের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। ফলে সাধারণ লোকের জানতে পারার অধিকার ইউরোপীয় 'জনপরিসর' ধারণার কেন্দ্রে অবস্থান করে। অন্যদিকে 'সাধুর বাজারে' অন্য সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি নিতান্তই গৌণ। মুখ্য হলো 'নিজ'কে বা আত্মতত্ত্বকে জানা। লালনের মত হলো : 'আপ্ততত্ত্ব যে জেনেছে/সর্বজ্ঞানী সে হয়েছে/ কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে'। এ ক্ষেত্রে মানুষরূপী গুরু সহায় হিসেবে থাকবেন।

জনপরিসর যুক্তিশীল। এখানে ব্যক্তি শুধু নাগরিক হিসেবে হাজির থাকেন। বিশেষ কোনো পদের অধিকারী হিসেবে নন। শক্তিশালী কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে তাঁর অবস্থান মিলে যেতে পারে বটে, কিন্তু শুধু ব্যক্তি নাগরিক সেখানে সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারেই মনোযোগী হবেন, বিশেষ স্বার্থের ব্যাপারে নয়। ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থানকে বিচার করবেন, পর্যালোচনা করবেন, গ্রহণ বা বর্জন করবেন যুক্তি প্রয়োগ করে। এমন নয় যে সবাই একই অবস্থান থেকে একইভাবে কোনো বিষয়কে মূল্যায়ন করবেন। আবেগ বা অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি একেবারে অনুপস্থিত থাকবে, তা নয়, বরং গণপর্যালোচনার তোড়ে কেবল যুক্তিশীল অবস্থানই এ পরিসরে টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে লালনের সাধুর বাজারের

বয়ানটি রীতিমতো কান্টের বয়ানের মতো মনে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বা আল্লাহ বিরাজ করেন। মানুষ নিজের রূপের মধ্যে ডুব দিয়ে যখন স্বরূপ অর্থাৎ নিজের মধ্যকার চিরায়ত রূপ আবিষ্কার করবে, তখন ব্যক্তি হিসেবে সে যে মতই দেবে, সেটি যুক্তিশীল ও সর্বজনীন হতে বাধ্য।

আমরা দেখি যে হেবারমাসের জনপরিসর এবং লালনের 'সাধুর বাজার' দুটোই আদর্শায়িত পরিসর। উভয়টিতেই সবার সমান অধিকার, সবাই যুক্তিশীল এবং সবাই কর্মতৎপর। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিলের দিকটি হলো: উভয়ই ঔচিত্যকে নির্দেশ করে (নরমেটিভ)। এদের মতাদর্শগত কল্পকাহিনিও (ইডিওলজিক্যাল ফিকশন) বলা যেতে পারে। এদের অমিলও অনেক। ইউরোপে শিক্ষিত শ্রেণির নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার রাশ টেনে ধরার চেষ্টার প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় জনপরিসর। এখানে শিক্ষিত শ্রেণি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। অপরদিকে নিম্নবর্গের মানুষেরা ক্ষমতার বলয় থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে নিজেদের মতো করে 'সাধুর বাজার' গড়ে নেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রান্তিক মানুষেরা আউল, বাউল, সাঁই, ফকির, সাহেবধনি, কর্তাভজা, কিশোরীভজা ইত্যাদি নামে নানান ধরনের দল ও উপদল তৈরি করে প্রচলিত মত ও পথ থেকে নিজেদের সবার থেকে গুটিয়ে রাখে। গোপন রাখে নিজেদের চর্চা ও সাধনাকেও। নিজেদের অন্যদের থেকে একেবারে উল্টোভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করে। এমনটা কেন হয়েছিল? এ ব্যাপারে হগ আরবানের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক: মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ছিল আর বিলাতি কোম্পানির শাসন যখন ধীরে ধীরে সুসংহত হচ্ছিল, তখন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উত্থান-পতন হচ্ছিল। এমন টালমাটাল অবস্থার চরম শিকার ছিল সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণি। আর তাই এই শ্রেণিটি চলমান পরিস্থিতিকে 'মোহ' হিসেবে চিহ্নিত করে আপাত সুখ খোঁজার চেষ্টা করেছে।[৪৬] অন্যদিকে, ইউরোপের জনপরিসর সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকের আলোচনার বিষয়বস্তু তো বটেই, সাধারণ লোকেরও প্রিয় বিষয় হিসেবে হাজির। কেননা, ধারণা হিসেবে ইউরোপ এবং জনপরিসর দুই-ই হেজিমনিক বা আধিপত্যশীল। এর বিপরীতে, 'সাধুর বাজার' এখনো ব্রাত্যজনদের গানেই রয়ে গেছে; অবজ্ঞা হয়তো নয়, রোমান্টিকতার বিষয় হিসেবে। সাধুর বাজারের ব্যাপারে মনোযোগের অভাব হয়তো দুটি জনগোষ্ঠীর চর্চার মাধ্যমের ভিন্নতার কারণেও হতে পারে। হেবারমাস লিখেছেন, ইউরোপের পড়ুয়া জনগোষ্ঠী কীভাবে জনপরিসর তৈরি করতে

ভূমিকা রেখেছে।[৪৭] কিন্তু যে জনগোষ্ঠীতে পড়ার সুযোগ ততটা সম্প্রসারিত হয়নি, তবে সচেতনতা সম্প্রসারিত হয়েছে, যেখানে বাক্স্ফূর্তি রয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে চিন্তার চর্চা শুরু হয়েছে, সেই জনগোষ্ঠীর জনপরিসর কোন গুণকে ধারণ করে তৈরি হবে? আমরা দেখছি যে বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেই পরিসর তৈরি হয়েছে গানকে আশ্রয় করে। সে জন্য এখানে চিন্তা ও পর্যালোচনার ভাষা হলো লোকগান বা লোকগীতি (অনেকে ভক্তিবশত এগুলোকে গুরুর কালামও বলে থাকেন); আর তাই এ গান যে কেউ যেকোনো সুরে গাইতে পারে। গীতি ও সুর এখানে মুখ্য নয়; মুখ্য হলো চিন্তা ও তৎপরতা।

উপসংহার

জনপরিসর ও সাধুর বাজার উভয়ই হলো এক আদর্শায়িত পরিসর, যেখানে সমতার নীতিকে আশ্রয় করে সমাজবদ্ধ মানুষ যুক্তি ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থ (বা সবার স্বার্থ) অর্জনের চেষ্টা করেন; যেখানে সমাজের সদস্যরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিবর্তনের কর্তা হিসেবে সচেতন থেকে পরস্পরের সঙ্গে এনগেজড বা আদান-প্রদানের সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকেন। কিন্তু ধারণা দুটোর লক্ষ্যের ব্যাপারে আপাত মিল থাকলেও অমিল অনেক। এই অমিল কি কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবধান এবং স্থানিক ও কালিক ব্যবধানের কারণে তৈরি হয়েছে, নাকি দার্শনিক ও ভাবগত অবস্থানের পার্থক্যের কারণে তৈরি হয়েছে, সে বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে। তবে এতটুকু বলা যায়, যে পরিসরকে হেবারমাস ইউরোপের ইতিহাস ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন, ঔপনিবেশিকতা, সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের চাপে পিষ্ট হয়েও বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য প্রকৃতির দিক থেকে প্রায় একই ধরনের পরিসর তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. পাবলিক স্ফিয়ার-এর সর্বজনগ্রহণযোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ এখনো চালু হয়নি। সাধারণত, পাবলিক স্ফিয়ারের বাংলা হিসেবে লোকায়তন, লোকপরিসর, জনায়তন, জনপরিসর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই প্রবন্ধে আমরা 'জনপরিসর' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

২. জনগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে শাসনকাঠামো বা রাষ্ট্রের কাজগুলোর পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের নামই হলো জনমত। Jurgen Habermas, The Public Sphere: An Encyclopedia Article. *New German Critique*, No. 3, 1974, p. 49.
৩. Jurgen Habermas, The Public Sphere, p. 49.
৪. Charles Taylor, *Modern Social Imaginaries*, Durham: Duke University Press, 2004, pp. 90-91.
৫. Jurgen Habermas, Further Reflections on Public Sphere, in Craig Calhoun ed. *Habermas and The Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1996, p. 423.
৬. Jurgen Habermas, The Public Sphere, p. 50.
৭. Jurgen Habermas, Further Reflections on Public Sphere, in Craig Calhoun ed. *Habermas and The Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1996, p. 440.
৮. Jurgen Habermas, The Public Sphere p. 52.
৯. Charles Taylor, *Modern Social Imaginaries*, Durham: Duke University Press, 2004, p. 83.
১০. Charles Taylor,*op. cit.*, p. 94.
১১. Charles Taylor,*op. cit.*, p. 87.
১২. Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge: MIT Press, p. 51.
১৩. Keith Michael Baker (1996/1992), Defining the Public Sphere in Eighteenth-Century France: Variations on a Theme by Habermas, in Craig Calhoun ed. *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press.
১৪. Habermas, Further Reflections on Public Sphere, p. 422.
১৫. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 422
১৬. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 436
১৭. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 440
১৮. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 426
১৯. Raymond Williams, *The Long Revolution*, London: Broadview Press, 2001.

২০. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 436.

২১. Jurgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, p. 437.

২২. Sudipta Sen, *Empire of Free Trade: The East India Company and The Making of Colonial Marktplace*, Philadelphia: University of Pennsilvania Press, 1998. Quoted in Hugh B Urban, *The Economics of Ecstasy: Tantra, Secrecy and Power in Colonial Bengal*, New York: Oxford University Press, 2001, p. 22.

২৩. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial Bengal*, Delhi: Oxford University Press, 1983, p. 258.

২৪. Sudipta Sen, Passages of Authority: Rulers, Traders, and Marketplaces in Bengal and Benaras, 1700-1750, *The Calcutta Historical Journal*, 1996, vol. 17, No. 1. pp.1-39.

২৫. Sumit Sarkar, *An Exploration of the Ramakrishna-Vivekananda Tradition*, Simla: Institute of Indian Studies, 1993.

২৬. Hugh B. Urban, The Marketplace and the Temple: Economic Metaphors and Religious Meanings in the Folk Songs of Colonial Bengal, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 4, 2001, p. 1086.

২৭. Hugh B Ruban, The Marketplace and the Temple, 2001, p. 1090.

২৮. শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই : দেশ, কাল এবং শিল্প*, কলকাতা : সম্বাদ, ১৯৯৫, পৃ. ২১৮।

২৯. Hugh B. Urban, *op. cit.*, p. 1095.

৩০. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২, পৃ. ১৮৬।

৩১. আবুল আহসান চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ১৮৬।

৩২. এই এড়িয়ে যাওয়া শক্তিহীনতার কারণে বা কৌশলগত কারণে সে বিষয়টি আরও গবেষণার দাবি রাখে।

৩৩. সুধীর চক্রবর্তী, *গভীর নির্জন পথে*, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৩৯।

৩৪. আবুল আহসান চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ১৮৬।

৩৫. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ৬৭৪।

৩৬. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৭. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত পৃ. ৮১।

৩৮. আবুল আহসান চৌধুরী, ২০০৯, পৃ. ৬৭৪।

৩৯. আবুল আহসান চৌধুরী, ২০০৯, প্রাগুক্ত।

৪০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩।

৪১. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭।

৪২. শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০/১৯৯৯ পৃ. ২৬২-২৮৭।

৪৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২, পৃ. ১৮০।

৪৪. আবদেল মাননান, *অখণ্ড লালনসঙ্গীত*, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী,২০১০, পৃ. ৬২।

৪৫. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৪৬. Sudipta Sen, *Empire of Free Trade: The East India Company and The Making of Colonial Marketplace*, Philadelphia: University of Pennsilvania Press, 1998, p. 58.

৪৭. Habermas, Further Reflections on Public Sphere, p. 423.

লালনের সামাজিক চুক্তি

শুধু বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে বাধ্য। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, প্রজাতিগতভাবে বেঁচে থাকার জন্যও সংঘবদ্ধতা জরুরি। প্রাণিজগতে মানবশিশুই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হীনবল ও অরক্ষিত থাকে, তাই অন্য কারও সাহায্য ছাড়া তার বেঁচে থাকা সবচেয়ে অনিশ্চিত। আর প্রকৃতি যখন বৈরী রূপে হাজির হয়, তখন এই অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হয়। অনিশ্চয়তাকে জয় করার প্রচেষ্টাতেই হোক আর সবার সঙ্গে বেঁচে থাকার আনন্দের জন্যই হোক, মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে যূথবদ্ধ জীবন যাপন করছে। এই যূথবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণতি হলো সমাজ। আমরা সেই সমাজে জন্ম নিই। বেড়ে উঠি। পরিণত হই। আবার সমাজেই মরি। মৃত্যুর পর আমাদের স্মৃতিটুকুও এই সমাজেই থেকে যায়। এককথায়, সমাজবদ্ধতা আমাদের ভবিতব্য। আর সমাজে বসবাস করার জন্য এর সদস্যদের কিছু বিষয়ে একমত হতে হয়, স্থির করতে হয়—কোনটা অবশ্যপালনীয়, কোনটা বর্জনীয়, কোনটা আদরের কিংবা অনাদরের। এই একমত হওয়াটাকে 'চুক্তি' বলা যেতে পারে। সে অর্থে সমাজে সব সময়ই 'সামাজিক চুক্তি' ছিল এবং আছে, এর তত্ত্বায়ন থাক আর না-ই থাক।

আমরা দেখেছি, ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে 'সামাজিক চুক্তি' বেশ আধিপত্যশীল। একটা উদাহরণ থেকে এই আধিপত্যের প্রাবল্য বোঝা যেতে পারে। সৌদি আরব ও ব্রুনাইয়ের মতো হাতে গোনা কয়েকটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাদে দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্রই তাদের সংবিধানে স্বীকার করে নেয় যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র হিসেবে তাদের উদ্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত কিংবা

বাংলাদেশের সংবিধান শুরু হয়েছে 'সামাজিক চুক্তি'কে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে। এই মতবাদের সৌন্দর্য হলো, বিভিন্ন তাত্ত্বিক ভিন্ন ভিন্ন আদি অনুমান (assumption) থেকে তাঁদের যুক্তির বুনন শুরু করেছেন, আর সবাই একই মোকামে এসে পৌঁছেছেন : সমাজে বসবাসের জন্য সবাই মিলে একরকমের আপসরফা বা চুক্তি করা অপরিহার্য।

পশ্চিমা চুক্তিবাদের সংকট

'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের প্রধানতম সংকট হলো এর 'নবায়ন' সংকট। অর্থাৎ যে চুক্তিতে সমাজ পৌঁছাল, সেই চুক্তির নবায়ন হবে, নাকি হবে না। চুক্তির যদি নবায়ন না ঘটে, তাহলে বৈধতার সংকট তৈরি হয়। আবার সেই চুক্তির নবায়ন কীভাবে হবে সেটা নিয়েও তর্ক অনেক। এখন তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্র 'সম্মতি উৎপাদনের' মাধ্যমে চুক্তির নবায়ন করে থাকে। কিন্তু কঠিন মনের মানুষ, যাদের থেকে সহজে সম্মতি আদায় করা যায় না, তাদের ব্যাপারে চুক্তিবাদীরা কি সহনশীলতা প্রদর্শন করে? আমরা দেখি, করে না। আবার চুক্তির নবায়ন যদি বারবার করতে হয়, তাহলে স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়তে পারে। যেমন আজ সবাই মিলে সাব্যস্ত করল যে উপযোগবাদী নীতির ভিত্তিতে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেই মোতাবেক সব শাসনযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানকে সাজানো-গোছানো হলো; দু-এক বছরের মাথায় আবার যদি সেই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করার বিধান থাকে এবং তখন যদি অন্য নীতির প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, তখন পরিণতি কী হবে? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি উপযোগবাদের বদলে (ইমানুয়েল কান্টের) কর্তব্যবোধের নীতিই সবার কাছে আদরণীয় ও প্রয়োগযোগ্য মনে হয়, তখন সংশ্লিষ্ট শাসনযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে তো আবার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ফলে সমাজে আর যা-ই হোক, স্থিতিশীলতা থাকবে না। সম্ভবত সেই আশঙ্কা থেকে রুশোর মতো উদার গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকও বলেছেন, সবাই মিলে চুক্তি করার পর কেউ যদি চুক্তি না মানে, তাহলে তাকে জোর করে 'স্বাধীন' বানানো হবে। রুশোর মত হলো : চুক্তিতে এ ধরনের জবরদস্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলেই চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক যন্ত্রটি কার্যকর থাকে, ফাঁকা বুলি হয়ে থাকে না। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে থাকে না।[১] তার মানে দাঁড়ায়, মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য চুক্তি করে বটে, কিন্তু এরপর চুক্তি নিজেই বিভিন্ন

রূপে তার ওপর চেপে বসে; মানুষ আর মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে না। চুক্তির ফলে তৈরি হওয়া সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানই হয়ে ওঠে মূল লক্ষ্য, মানুষকে হতে হয় উপলক্ষ। রবার্ট নজিক তাই বলেন, 'আমাদের অতি আদরের রাষ্ট্র এমন একটি সংগঠন, যাকে তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সেবার জন্য। কিন্তু রাষ্ট্রই এখন সবকিছুর কেন্দ্র। আর এটা যে সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি হয়েছিল, রাষ্ট্র তার চাইতে বেশি সমস্যার জন্ম দিয়েছে।'[১২]

আমরা জানি, পশ্চিমে সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে অপশ্চিমা জীবন কি চুক্তিবিহীন? মোটেও চুক্তিবিহীন নয়। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যেকোনো মানুষ এ ব্যাপারে একমত হবে যে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের চুক্তি বা সমঝোতা ছাড়া সামষ্টিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এই কথার সূত্র ধরে বলা যায় যে আমাদের বঙ্গীয় জনপদে হাজার বছর ধরে যাঁরা বসবাস করেন জীবনের প্রয়োজনে, তাঁরাও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে সে ব্যাপারে কোনো তত্ত্বায়ন আজও হয়নি। আমাদের মনে তাই প্রশ্ন জাগে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েই থাকেন, তাহলে তাঁদের সম্পন্নকৃত 'চুক্তি' পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মেনে নেওয়া কি বাধ্যতামূলক? আমি যদি সরাসরি বা আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো চুক্তির অংশ না হই, তাহলে সে চুক্তির শর্ত আমি কেন মানব? আর আমরা যদি সেই চুক্তির শর্তে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে চাই কিংবা চুক্তিটিকে নবায়ন করতে চাই, তাহলে সেটা কেমন করে হবে? আমরা দেখি যে পশ্চিমা 'সামাজিক চুক্তি' আমাদের এসব প্রশ্নের বিষয়ে নড়েচড়ে বসে; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব হাজির করে না।

লালনের সামাজিক চুক্তি

আমাদের সমাজে যে বিষয়গুলো 'পাপ' বা 'পুণ্য' হিসেবে চিহ্নিত হয়, সেগুলো একধরনের সামাজিক চুক্তির ফল বলে লালন আমাদের জানান। স্থান ও কালভেদে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ভিন্নতার কারণেও মানুষের সুযোগের তারতম্য ঘটে। তৈরি হয় বিচিত্র রকম সমস্যা। আর এদের সমাধানও হয় বিচিত্র রকম। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের স্ব স্ব বাস্তবতাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য যে ব্যাপারগুলোতে ঐকমত্যে

পৌঁছায়, সেগুলোকেই সবার জন্য 'পালনীয়' হিসেবে উপস্থাপন করে। আধুনিককালে এদের অন্য নাম 'রুল অব থাম্ব', প্রথা বা আইন। আর ঐকমত্যের ফলগুলোকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে হাজির করা হতো 'পাপ-পুণ্যের' মোড়কে। 'করণীয়' পুণ্যের খেতাব পেত, আর 'বর্জনীয়' পেত পাপের। দার্শনিকেরা এগুলোকে পজিটিভ মোরালিটি বা সরাসরি নৈতিকতা বা সামাজিক নৈতিকতা বলেন।[৩] একে ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যক্তিবিশেষ মূঢ় বা মূক হতে পারে, কিন্তু সমাজের জন্য ভাষা অপরিহার্য। ভাষা ছাড়া সামাজিক জীবন অসম্ভব। ঠিক তেমনি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নৈতিকতাবিবর্জিত থাকতেও পারেন, কিন্তু সামাজিক জীবনের জন্য অবশ্যই একগুচ্ছ 'স্পষ্ট করে বলা' নৈতিকতা থাকা আবশ্যক। সেই নৈতিকতা বা রীতি সব দেশে সব সময়ে এক রকম থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মেই বদলায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া থেকে মানবকুলের উদ্ভব। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে আদি পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। তখনকার দিনে সেটাই ছিল নিয়ম এবং একই সঙ্গে নৈতিকতা। কিন্তু আজকের দিনের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের কেউই ভাই ও বোনের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অনুমোদন করেন না; বরং একে নিকৃষ্ট ধরনের পাপ বলে গণ্য করেন। এই ব্যাপারটা তাঁর গানে লালন ব্যাখ্যা করে বলেন :

এক দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই
পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই
তিব্বত নিয়ম অনুসারে
নারী বহু পতি ধরে
এদেশেতে হলে পরে
ব্যভিচারী গণ্য হয়।

...

দেশ সমস্যা অনুসারে ভিন্ন বিধান হতে পারে
লালন বলে তাই জানিলে
পাপ-পুণ্যের আর নাই বালাই।

তাঁর গানের এ কয়টি লাইনে লালন স্পষ্ট করে বলছেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যে রীতিটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় থাকে, সময় এবং পরিস্থিতি ভিন্ন হলে তা সবার কাছে 'বর্জনীয়' বলেও গণ্য

হতে পারে। এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। জেরেমি বেন্থাম এই বিষয়টিই একটু ভিন্ন ভাষায় বলেন: 'Whatever now is established, once was innovation'।[8] এ মুহূর্তে যে 'নিয়ম' বা 'নৈতিকতা'র ব্যাপারে আমরা সবাই একমত, সেটি সর্বজনীন নয়। পাপ, পুণ্য ইত্যাদি ঐশ্বরিক এবং সেহেতু এগুলো অপরিবর্তনীয়, এমন চিন্তা থেকে ধর্মবাদীরা এসবের সর্বজনীন প্রয়োগ চান। লালন এই মতকে পুরোপুরি নাকচ করেন। তিনি বলেন, এগুলো ঐশ্বরিকও নয়, মহাজাগতিকও নয়। তাই স্থান ও কালের, অর্থাৎ পরিস্থিতির, বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাপ-পুণ্যের ধারণাও বদলায়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এখানে তিনি মানুষকে মানব সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। মানুষ সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে একধরনের চুক্তির ভিত্তিতেই করণীয় ও বর্জনীয়র তালিকা তৈরি করে। তারপর সেগুলোকে পাপ-পুণ্যের মোড়কে হাজির করে সামষ্টিক জীবনকে স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে। চুক্তির মধ্য দিয়ে সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করে। আর এটিই সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি।

পাপ-পুণ্য বা সামাজিক নৈতিকতা যদি পরিবর্তনশীল হয়, ধ্রুব না হয়, তাহলে ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিও তো নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের প্রচলিত নৈতিকতায় নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সংগত কারণেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, লালন যে কথা বলছেন, তার ফলে মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কি কোনো প্রভেদ থাকে? অন্য জীব যেমন শুধু প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করেই জীবন পার করে দিতে পারে, লালন কি তেমনটা করারই কৌশল তৈরি করছেন না? মানুষ যদি সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে নিজের ইচ্ছাধীন চলে বা চলতে চায়, পাপ-পুণ্য বলতে যদি কিছু না থাকে, তাহলে ভালোমন্দের ফারাকও তো থাকে না। আর মানুষ যদি ভালো-মন্দের বিবেচনাবোধ থেকে সরে আসে, তাহলে সামাজিক যে নৈরাজ্য দেখা দেবে, সে বিষয়টা কি তিনি ভেবে দেখেননি? এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে লালন প্রচলিত নৈতিকতাকে একেবারে খারিজ করেননি, বরং নৈতিকতা যে সমাজবদ্ধ মানুষের একটি বিশেষ মুহূর্তের ঐকমত্যের ফল, এবং সে জন্য পরিবর্তনীয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভালো কথা, এই গান থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে লালন প্রচলিত সামাজিক নৈতিকতার সর্বজনীন কোনো ভিত্তি থাকা যে সম্ভব নয়, সেদিকেই বুঝি ইঙ্গিত করেছেন। নৈতিকতার সর্বজনীন ভিত্তি যদি একেবারেই

অনুপস্থিত থাকে, তাহলে গোটা পৃথিবীব্যাপী উদার মানবতাবাদী ভাবধারা ধুলায় লুটাবে। লালন নৈতিকতার সর্বজনীন ভিত্তি হিসেবে নতুন কিছুর প্রস্তাব করেছেন : প্রত্যেক মানুষ একটিমাত্র নীতিতে অটল থাকার জন্য চুক্তিবদ্ধ।

লালনের ব্যক্তিগত নৈতিকতার চুক্তি

লালন তাঁর কালামে বারবার একধরনের চুক্তির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করবো সাধন
লালন বলে সে কথা মন
ভুলেছ এ ভবের লোভে।[৫]

কিংবা,

'কী বলে এই ভবে এলি কী না কর্ম করে গেলি।
মিছে মায়ায় ভুলে র'লি সে কথা তোর মনে হয় না ॥[৬]

আবার, অন্যত্র লালন বলেছেন :

এ জনম গেলোরে অসার ভেবে।
পেয়েছো মানবজনম হেন দুর্লভ জনম আর কি হবে ॥
জননীর জঠরে যখন অধোমুণ্ডে ছিলেরে মন।
বলেছিলে করবো সাধন এখন কি তা মনে হয় না ভবে।[৭]

এসব গানে লালন বলছেন, জন্ম নেওয়ার আগে প্রতিটি মানবশিশু 'সাধন করার' প্রতিজ্ঞা করেছে। এই প্রতিজ্ঞা একধরনের চুক্তি। অন্যভাবে বললে এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের অলিখিত চুক্তি। এই চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো পুরস্কার প্রদান কিংবা ভঙ্গ করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক শাস্তির ব্যবস্থা থাকে না বটে, কিন্তু এ ধরনের প্রতিশ্রুতি রক্ষাকে ব্যক্তির সদ্‌গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে উল্লেখিত বাণীগুলোতে যে ধরনের 'বলা' আছে, সেটা অর্থপূর্ণ হয় কেবল একাধিক পক্ষের উপস্থিতিতে। শুধু একক সত্তা বা মানুষের জন্য প্রেক্ষাপটবিহীন প্রতিজ্ঞা বা ওয়াদা অর্থহীন। তাহলে জন্ম নিতে যাওয়া মানবশিশুটি কার সঙ্গে 'চুক্তি' করছে? কোথায় হয়েছে এ চুক্তি? এ বিষয়ে লালন নিশ্চুপ। এ ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে পারি :

ক) সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে, কোনো দেবতা বা ঈশ্বর হলেন এই চুক্তির অন্য পক্ষ। কিন্তু আমরা জানি, লালন খোদ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে স্থাপন করেছেন। লালন অন্যত্র বলছেন, 'শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে/ দেখতে যেন ভুজাঙ্গনা/ যেখানে সাঁইর বারামখানা'। মানুষ যাকে দেবতাজ্ঞান করে, তার বসত কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব যখন কোনো ব্যক্তি জানতে পারে, তখন সে সাপ দেখলে যেভাবে চমকে ওঠে, সেভাবেই চমকে ওঠে। আর তা ছাড়া লালন স্রষ্টা বা দেবতা নিয়ে কম চিন্তিত। বরং তিনি চিন্তিত যাকে চিনলে স্রষ্টাকে জানা যাবে, তাকে নিয়ে। অর্থাৎ মানুষকে নিয়ে। সে জন্য, কোনো ঈশ্বরের সঙ্গে সে চুক্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

খ) এ চুক্তি কি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির? জন্মের আগে মায়ের গর্ভেই অনাগত শিশুর দেহে প্রাণ আসে। আর সেই প্রাণ নিয়ে শিশুটি অধোমুণ্ড থাকে, অর্থাৎ মাথানত করে থাকে। এ থেকে মনে হতে পারে দুনিয়ার শর্ত মেনেই শিশুটি দুনিয়াতে আসতে ইচ্ছুক। সাধারণভাবে বলা হয় যে মানবশিশু জন্মানোর সময় পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজনসহ গোটা সমাজের প্রত্যাশা নিয়ে জন্মায়। অন্যভাবে বললে, জন্মানোর পর তাঁরা সবাই মানবশিশুটির ওপর সমাজের সব শর্ত চাপিয়ে দেন। আর মানবশিশুটিও সমস্ত শর্ত গ্রহণ করে ফেলে বিনা বাধায়। সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াটার নাম দিয়েছেন সামাজিকীকরণ। কিন্তু লালন কি মানবশিশুকে যথাযথ সামাজিকীকরণের কথা বলছেন? এমনটি হবার কথা নয়। কেননা, প্রথমত, লালন জানেন সমাজ কোনো এককাট্টা বিষয় নয়। এর মধ্যে নানান স্তর আছে; নানান স্তরের মানুষের স্বার্থ, রুচি, চিন্তা ও তৎপরতা একেক রকম। প্রতিটি স্তরের স্বার্থ, সাধনা এবং কর্ম-তৎপরতা আলাদা আলাদা। ফলে সদ্য জন্ম নেওয়া, অথবা জন্ম নিতে যাওয়া একটি শিশু সমাজের কোন স্তরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে? প্রতিপত্তিশালী স্তরের দাবি হলো চলমান নীতি আত্মস্থ করা ও তার প্রতি অনুগত থাকা; অন্যদিকে নির্যাতিত স্তরটির স্বাভাবিক দাবি থাকে চলমান কাঠামোকে ভেঙে ফেলা, বদলে ফেলা। তাহলে একজন নতুন আগন্তুক সমাজের কোন স্তরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন, সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত দেবে? বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার নামে যেসব শর্ত চালু আছে, সেগুলোর বিষয়ে আমাদের নতুন আগন্তুক কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে? আমরাই-বা তাকে এ

বিষয়ে কী পরামর্শ দেব? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের সঙ্গেও নতুন আগন্তুকের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

গ) এ চুক্তি কি নিজের সঙ্গে নিজের? লালন এ বিষয়ে স্পষ্ট করে আমাদের জানাননি। তবে তাঁর বাণী বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই চুক্তি নিজের সঙ্গে নিজের। নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তি তখনই হওয়া সম্ভব, যখন নিজের অস্তিত্বের দ্বৈততা স্বীকার করে নেওয়া হয়। লালন যে আপন সত্তার দ্বৈততা স্বীকার করেন, তা বোঝা যায় তাঁর কালাম থেকে, 'তুমি আর মন/ মানুষ দুইজন/ দুইজনাতে হয় আলাপন'। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তোমার ঘরে বাস করে কারা ও মন জান না/ একজনে ছবি আঁকে একমনে আরেকজনে সেই ছবিতে রং মাখে/ আবার সেই ছবিটা নষ্ট করে কোন জনা'। এখানে লালন আবার মানুষের মানস-গঠনে একাধিক সত্তার যুগপৎ উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। লালনের কালাম থেকে আমরা সাধারণভাবে বুঝে নিতে পারি যে নিজের অস্তিত্বের একটি অংশ আরেকটি অংশের সঙ্গে ভাব বিনিময়, আপসরফা, চুক্তি ইত্যাদি করে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে ততটা সজাগ থাকে না। তিনি যখন বলেন, 'যখন ভিটেয় হয় বসতি দিয়েছিলে খোশ কবুলতি', তিনি আসলে দেহরূপ ভিটায় প্রাণসঞ্চারকেই বোঝাতে চেয়েছেন। মানবভ্রূণে যখন প্রাণসঞ্চার হয়, তখনই সে একটি চুক্তিতে পৌঁছে। চুক্তিটি হলো ব্যক্তির নিজের জীবসত্তার সঙ্গে অন্য সত্তার (আমরা একে যুক্তি বা বুদ্ধি বলতে পারি) সহাবস্থান। সহাবস্থানকারী এই সত্তাগুলোর মধ্যকার চুক্তি হলো সাধনার মাধ্যমে মানব-জনমকে সার্থক করে তোলা। সেই চুক্তি অনুযায়ী সাধনা বিধেয়। সেই চুক্তির শর্ত পূরণ করতে গড়িমসি কোনোক্রমেই কাম্য নয়। লালন বলেন :

> 'সুখ পেলে হও সুখভোলা দুখ পেলে হও দুখ উতলা।
> লালন কয় সাধনের খেলা কিসে যুত ধরে ॥'[৮]

অর্থাৎ সাধনার ফলে সুখ বা দুঃখ দুই-ই সাময়িকভাবে মানুষের জীবনে আসতে পারে। এর কোনোটাতে উদ্বেলিত বা বিচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সাধনা করতে গিয়ে কারও মন উচাটন হয়, কারও সাধন-ক্রিয়ায় মন বসে না, কেউ আবার এর আড়ম্বরে মজে সুখভোলা হয়, আবার কেউ দুঃখ পেয়ে উতলা হয়ে ওঠে। লালন বলেন, নির্বিকার মনোভাব নিয়ে সাধনার পথ চলার নামই সার্থকতা। সাধনার মাধ্যমেই ব্যক্তি তাঁর বাস্তব জীবনের করণীয়

জানতে পারে, জীবনে বেঁচে থাকার শর্তকে নতুন নতুনভাবে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে। কারণ, ব্যক্তির করণীয় কী, সেটা আগে থেকে স্থির করা থাকে না (যদি আগে থেকে স্থির থাকে, তাহলে ব্যক্তি তাঁর স্বকীয় মহিমায় বিকশিত হতে পারে না। সমাজ বা অন্য কারও চাপে পিষ্ট হয়ে একটি রূপ লাভ করে মাত্র)। সে জন্য লালন ব্যক্তিকে সাধনার মাধ্যমে তাঁর করণীয় স্থির করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সাধনা যেকোনো সময় করা যেতে পারে

আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে প্রতিটি মানুষই সাধনা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে 'ঝকমারি দুনিয়াদারি' দেখে কিংবা 'ভবের লোভে' বা 'মিছে মায়ায়' অনেকেই সাধনার কথা ভুলে যায় এবং হীন উদ্দেশ্যে জীবনের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ খরচ করে ফেলে। মানব জনমের একটি বড় অংশ লোভাতুর বা মায়াচ্ছন্ন হয়ে কেটেছে বলে কি গোটা জীবনটাই ওভাবে কাটাতে হবে? লালন কাউকে হতাশার সাগরে ভাসতে দেন না। আশাবাদী লালন বলেন, 'আমি বসে আছি আশা-সিন্ধুর তীরে গো সদাই'। যাঁরা মনে করেন এ জীবন অসার এবং অর্থহীন, লালন তাঁদের দলের নন। তিনি মনে করেন, মানব জীবনের অন্তর্গত মূল্য রয়েছে। আর এ মূল্য অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজে থেকেই মূল্য বহন করে। লালন হতাশার পথ মাড়ান না কখনো। তিনি বলেন, 'এখনো চলছে পবন হতে পারে কিছু সাধন'।[৯] তার মানে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ সাধনা। সাধনার সময়-অসময় নেই। আর সাধনাতেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। আর সাধনার জন্য দরকার শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, 'গুরু ধরো করো ভজনা/ তবে হবে তোর সাধনা'।[১০]

চুক্তির সীমা

লালন বলেন, 'যা করার তাই কর রে মন/ পিছের কথা রেখ স্মরণ বরাবরই'।[১১] অর্থাৎ, করণীয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন। লালন ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। সাধুর বাজারে মানুষ এসে সাধনার জায়গাটা বেছে নেবে; তবে শর্ত হলো তার প্রেক্ষাপট সব সময় মাথায় রাখতে হবে। খেয়াল করতে হবে তাঁর সাধনা সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলবে, তার নিজের ওপরই-বা কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

লালন অতীতের কোনো শর্তকে মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তির ক্ষেত্রে বাধা হতে দিতে নারাজ। বর্তমানের সাধনা, বর্তমানের কর্মযজ্ঞ এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা—এগুলোর কোনোটিই অতীত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

পূর্বের কথা ছাড়ান দাও ভাই।
সে লেখা তো থাকে না সাধনের দাঁড়ায় ॥[১২]

পূর্বকথা মানে অতীত। ইতিহাস। আমাদের জীবনে পূর্বকথার মূল্য কতটুকু?—এ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লালন ভবিষ্যৎকে অতীত থেকে মুক্ত করার চূড়ান্ত রায়টি দেন। তিনি জোরের সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যকে আমাদের চিন্তা ও কর্মের চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কেন? তিনি কি জানেন না যে বর্তমানে আমাদের যা কিছু আছে, তা অতীতের কর্মকাণ্ডের ফল? আমাদের বর্তমান মুহূর্তকে সংজ্ঞায়িত করার জন্যও অতীত দরকার। অতীতের সাপেক্ষেই তো বর্তমান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে আমরা কোনোভাবেই আমাদের অতীতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। তারপরও লালনের পূর্বকথার ব্যাপারে এত কঠোর মনোভাব পোষণ করার কারণ কী? প্রথমত, জর্জ ইগার্স থেকে আমরা জানি, পূর্বকথা বা ইতিহাসের কিছু অংশ আবশ্যিকভাবে অনুমাননির্ভর হতে বাধ্য।[১৩] এখানে বলা আবশ্যক যে সেই অনুমানও আমাদের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগে। যেমন আমাদের প্রিয় 'সোনার বাংলা' অতীত সম্পর্কে একটি নিছক অনুমান। 'সোনার-বাংলা' সুদূর অতীতের কোনো বাস্তবতা না হলেও বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে এটি আমাদের শক্তি-সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। তবে অতীত কিন্তু সব সময় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে গড়ার জন্য সহায়ক হয় না; বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের যে অতীতাশ্রয়ী গল্প বিভিন্নভাবে শাস্ত্রে ও সমাজে হাজির আছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের মূল্যায়ন কেমন হবে? সেগুলো কি একটি শোষণ-বঞ্চনাহীন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ নির্মাণের জন্য সহায়ক হবে? পূর্বে কার জন্ম কোথায় হয়েছিল, কার গোত্রবর্ণ কী, কার পেশা কী, কে কার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এ বিষয়গুলো প্রায়ই সমাজে বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লালন সেসব বিষয়ে আমাদের সজাগ করে দেন। আবার অতীতে আমরা একটি নির্দিষ্ট ছক মেনে চিন্তাভাবনা করেছি, জীবন যাপন করেছি; আর সেই কারণে সেটাই স্বাভাবিক চিন্তা—এমন যুক্তি নারীদের জন্য উদার নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়। ধনী-নির্ধন সম্পর্ক পূর্ব থেকেই চলে এসেছে এবং সে জন্য এ সম্পর্ক ন্যায্য—এমন বক্তব্যও আমাদের সমাজে কম আদরণীয় নয়। এসব কারণে

পূর্বকথা অগ্রাহ্য করার প্রস্তাব তাঁর। বাস্তব জীবনে লালনও তা-ই করেছিলেন। তিনি তাঁর অতীতকে সাধনার পথ থেকে একেবারেই আলাদা রেখেছিলেন; যে কারণে তিনি হিন্দু না মুসলমান, সে বিবাদ আজও আছে। তার মানে, লালন অতীতের চুক্তির শর্তকে সমাজের নতুন সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে মানছেন না।

সামাজিক চুক্তি ও ব্যক্তিগত চুক্তির মধ্যে সম্পর্ক

আমরা জানি, প্রতিটি সমাজে সামাজিকীকরণ একটি স্বাভাবিক এবং অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। এর ফলে সমাজের নতুন সদস্যরা জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় নিয়মগুলো অনায়াসে আত্মস্থ করতে পারে। এর মাধ্যমেই সমাজ তার সদস্যদের মাঝে পজিটিভ মোরালিটি বা সামাজিক নৈতিকতা আরোপ করে। এ ধরনের নৈতিকতা প্রোথিত থাকে ধর্মীয় বিধিবিধান, সামাজিক রীতিনীতি আর আচার-অনুষ্ঠানে।[১৪] এগুলো সামাজিক (কখনো রাষ্ট্রীয়) প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে চর্চিত হয়। কেউ যখন এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে, তখন আমাদের কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি তার বুদ্ধি প্রয়োগ করছে, নাকি অভ্যাসবশত বা সামাজিক চাপে বা প্রবণতাবশত করছে। এ কারণে, ব্যক্তি যখন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান মেনে চলে, তখন আমরা তার কর্তাসত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি না। ব্যক্তি তার কর্তাসত্তা নিয়ে হাজির থাকে র‍্যাশনাল মোরালিটি বা বুদ্ধিজাত নৈতিকতায়। কিন্তু বুদ্ধিজাত নৈতিকতা কখনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রীতি-নীতি-আশ্রয়ী থাকে না। এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির, এমনকি সামাজিক নৈতিকতার পর্যালোচনা জারি রাখে। কোনো একটি বিষয়কে যতই গ্রহণযোগ্য মনে হোক না কেন, সব মানুষ আর সব বিশেষজ্ঞও যদি একে অনুমোদন দেন, তারপরও আমরা সেই অবস্থানের 'চূড়ান্ত' ন্যায্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না। একই বিবেচনায় আমরা আমাদের 'সিদ্ধান্ত', 'মতামত' বা 'আচরণের' ন্যায্যতার ব্যাপারেও নিঃসন্দেহ হতে পারি না। এ মুহূর্তে সব মানুষ আমাদের সঙ্গে একমত হলেও আমরা ভুল করতে পারি। যেমন একসময় 'দাসপ্রথা' বা 'বর্ণপ্রথা'কে প্রায় সবাই ন্যায্য মনে করত। কিন্তু এখন আমরা জানি, এগুলোর চাইতে অন্যায্য সম্পর্ক দুনিয়াতে খুব কমই আছে। সবাই একমত হলেও সামাজিক নৈতিকতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অবিকৃত থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সে জন্য

বুদ্ধিজাত নৈতিকতা একধরনের আদর্শ পাহারাদার বা নিরীক্ষকের মর্যাদা নিয়ে থাকে। আমরা যখন সামাজিক বা ব্যক্তিগত নৈতিকতার ব্যাপারে আলোচনা করি, তখন এমন বিষয়ে কথা বলি, যা বর্তমানে হাজির, যাকে আমরা দেখি বা দেখাতে পারি। কিন্তু সামাজিক নৈতিকতা যেভাবে সমাজে বা আমাদের মধ্যে হাজির থাকে, বুদ্ধিজাত নৈতিকতা সেভাবে সমাজে বা দশের মাঝে হাজির থাকে না। এ মুহূর্তে সমাজে যা অনুপস্থিত এবং যার সামাজিক উপযোগিতা আমরা বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝতে পারছি, সেটাই হলো বুদ্ধিজাত নৈতিকতা। এটি একধরনের আদর্শ অবস্থা ও অবস্থানকে নির্দেশ করে। কেননা, এটি এ মুহূর্তের (বা সব মুহূর্তেরই) বাস্তবতা নয়; কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা থেকে শ্রেয়তর। এর অন্তর্গত মূল্য রয়েছে। বুদ্ধিজাত নৈতিকতা পুরোপুরি না হলেও, কিছু মাত্রায় বাস্তবায়নযোগ্য।[১৫]

প্রশ্ন আসতে পারে, নৈতিকতার আলোচনায় ব্যক্তির কেন গুরুত্ব পাওয়া উচিত? ব্যক্তি যদি শুধু সমাজ-আরোপিত বিষয়াদি নির্বিবাদে মেনে নেয় ও সব রকম বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলে, তাহলে মানুষে আর যন্ত্রে (যেমন রোবট) কী ফারাক থাকে? সে জন্য লালন সমাজের মাঝে ব্যক্তিকে একেবারে হারিয়ে যেতে দিতে নারাজ। আমরা সামাজিক নৈতিকতাকে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বা পাপ-পুণ্যের ধারণায় খুঁজে পাই। ব্যক্তির নৈতিকতাকে কোথায় পাব? সমাজের মধ্যে ব্যক্তির বসবাস হলেও চূড়ান্ত বিচারে সমাজ আর ব্যক্তি তো এক নয়। এমনটি ঘটা স্বাভাবিক যে ব্যক্তি বিভিন্ন চাপে, লোভে, অভ্যাসবশত বা মনোজাগতিক প্রবণতার কারণে সামাজিক নৈতিকতাকে মেনে চলে; কিন্তু মন থেকে এসব বিষয়কে অনুমোদন বা স্বীকৃতি কোনোটিই দেয় না। এমন পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষ যখন লোভে, চাপে, অভ্যাসবশত বা নির্দিষ্ট কোনো প্রবণতার কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচারকে পর্যালোচনাহীনভাবে ক্রমাগত অনুসরণ করতে থাকে, তখন সে সমাজ ও রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক হতে থাকে। এ ধরনের আচারকে প্রতিনিয়ত পর্যালোচনাধীন রাখার জন্য চাই ব্যক্তির বুদ্ধির নিরন্তর চর্চা। আর এ চর্চার ফলেই আমরা বুদ্ধিজাত নৈতিকতাকে পাই। লালন সমাজের এবং রাষ্ট্রের নৈতিকতার দিকে না ঝুঁকে ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিজাত নৈতিকতাকে বিকশিত করতে চান। লালন এই বুদ্ধিজাত নৈতিকতার চর্চা ও বিকাশকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে একে এক কাল্পনিক চুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তি কেন?

নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তির নাম নৈতিকতা। নৈতিকতা হলো সেই আইন, যা ব্যক্তি নিজের ওপর নিজে আরোপ করে। রাষ্ট্রের বা সমাজের আইনের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো, এসব আইন প্রয়োগের জন্য অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করতে পারে, জোর করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি নৈতিক আচরণ করছে কি না, সেটা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই বলতে পারেন, অন্য কেউ নয়। সে জন্য ফুকোও বলেন, নৈতিকতা হলো গভর্নিং অব দ্য সেলফ বা কনডাক্ট অব দ্য সেলফ। নৈতিকতা হলো এমন বিষয়, যা ব্যক্তির ওপর কেউ চাপিয়ে দিতে পারে না। ব্যক্তিকে বাধ্য (enforce) করতে পারে না। বাইরে থেকে কেউ নৈতিকতা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিলে বা অন্যকে বাধ্য করলে সেটা আর যা-ই হোক, নৈতিকতার আওতার মধ্যে থাকে না।[১৬] তখন নৈতিকতা তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আইনের সীমার মধ্যে ঢুকে যায়। নৈতিকতা রক্ষিত হচ্ছে কি না, সেটি দেখার জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ নয়, ব্যক্তি নিজেই নিজের পাহারাদার হিসেবে থাকে। সে জন্যই হয়তো লালন এমন এক কাল্পনিক চুক্তির অবতারণা করেছেন, যেখানে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে নিজে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

তুলনামূলক আলোচনা

লালন চুক্তি সম্পাদনের সময় হিসেবে কেন জন্মমুহূর্তকে বেছে নিলেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে পশ্চিমা সামাজিক চুক্তি থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি আমাদের সাহায্য করবে। সে জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে পশ্চিমা সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপট আলোচনা করব। প্রকৃতির রাজ্যে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা মানুষ কেন চুক্তি করতে গেল? এমন প্রশ্নের জবাবে রুশো বলেন, যত দিন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তৈরি হয়নি, তত দিন কোনো ধরনের চুক্তিরও দরকার হয়নি। নিজের সক্ষমতার সৃষ্টিশীল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যখন প্রকৃতির অবিরাম রূপান্তর ঘটিয়ে চলছিল, তারই এক বিশেষ পর্যায়ে নানান ধরনের অসাম্য বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হতে শুরু করল। একসময় জন্ম নিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। কিছু মানুষ অন্যাদের তুলনায় বেশি সম্পদশালী হলো। তখন সম্পদের মালিকেরা সম্পদহীনদের কাছ থেকে সম্পদকে রক্ষা করার জন্য উপায় খুঁজতে শুরু করলেন। আর চুক্তি হলো সেই

উপায়। বলা হলো, এই চুক্তির দ্বারা এমন এক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা বিচক্ষণ আইন দিয়ে শাসন করবে, সবার দেখভাল করবে এবং শত্রুর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করবে; ফলে সমাজে চিরশান্তি বিরাজ করবে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সবাই যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, তাই এটি ন্যায্য। এর শর্ত মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সবার কর্তব্য। অন্যদিকে রুশো দাবি করেন, এই চুক্তি অন্যায্য। কারণ, এটি সম্পন্ন হয়েছে একটি অসম পাটাতন থেকে। ধনী ও নির্ধন—এই দুটি শ্রেণির উপস্থিতি চুক্তিপূর্ব সময়ে স্পষ্টতই তাঁদের মধ্যে ছিল। আর ধনী ও নির্ধন কি একইভাবে হাজির থাকেন? ধনী ও নির্ধন কি কার্যত কখনো সমান? অথচ ধরে নেওয়া হয়েছে যে চুক্তি সম্পাদনের আগে তাঁরা সমান ছিলেন, চুক্তির পরে তাঁরা আরও সমান হলেন। যদিও চুক্তিটি হয়েছে অসমতার ভিত্তিতে, ঐতিহাসিকভাবে দাবি করা হয় যে এটি সম্পাদিত হয়েছিল সমতার ভিত্তিতে। এ জন্য এর ফল হয়েছে বিষম। রুশোর রায় হলো, যে সামাজিক চুক্তির বলে এত সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, সেই চুক্তির ভিত্তিটাই ছিল অন্যায্য (the foundations of it were ill laid)। আর এর ফলে তৈরি হওয়া সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তাদের আদি পাপ আজও খণ্ডন করতে পারেনি। এর বহু বছর পর 'পাপ'মোচনের এক প্রকল্প হাজির করেন জন রাউলস। তিনি বলেন, যে ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে ঘটে গেছে, তাকে খণ্ডন করার কোনো উপায় নেই; সংশোধনও সম্ভব নয়। তিনি ভাবলেন, ঐতিহাসিকভাবে যা ঘটার তা ঘটেছে, তাই বলে একে তো চলতে দেওয়া যায় না। নতুন করে কীভাবে শুরু করা যায়? এই চিন্তা থেকে রাউলস দুটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। প্রথমত, যে আদি চুক্তির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি ন্যায্য ছিল না। এখন সমাজে ন্যায্যতা আছে, সে দাবি করা মুশকিল। ভবিষ্যতের পরিস্থিতি ন্যায্য হবে—এমনটা আমরা কেবল আশা করতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ন্যায্য পরিস্থিতির কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তাহলে প্রশ্ন, সম্ভাব্য ন্যায্য পরিস্থিতি কী রকম হবে? অথবা আমরা এমন একটি সম্ভাব্য ন্যায্য পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি করতে পারি? দ্বিতীয় প্রশ্ন: যদি এমন একটি ন্যায্য পরিস্থিতি আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলে সেখানে মানুষ যদি পরস্পরের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সেই চুক্তির শর্তগুলো কী হবে? সেই শর্তগুলো আমরা যদি আবিষ্কার করতে পারি, সেটিই হবে সবার জন্য প্রযোজ্য চুক্তি। সেটা হবে সর্বজনীন। একই সঙ্গে তা গণতান্ত্রিক। সর্বোপরি, ন্যায্য।[১৭]

আমরা জানি, মানুষ স্বার্থতাড়িত। এ স্বার্থ বস্তুগত ও অবস্তুগত (বা প্রতীকী) দুই রকমেরই হতে পারে। এটা তো স্পষ্ট যে নিজেদের স্বার্থ যদি দৃশ্যমান থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থের ব্যাপারে মনোযোগী হবে। আর আপন স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ যদি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সাধারণ স্বার্থের প্রশ্নে যে সবাই নিবিষ্ট হবেন, সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল। তাই জন রাউলস ন্যায্যতার শর্ত প্রতিপাদনের জন্য একটি চিন্তানির্ভর পরীক্ষণের আশ্রয় নেন। এর মাধ্যমে তিনি চুক্তির সম্ভাব্য সব পক্ষকে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনে রাখতে চান। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক। সব পক্ষকে যদি এমন এক পরিস্থিতিতে রাখা যায়, যেখানে তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য, দুর্বলতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ইত্যাদির বিষয়ে অন্ধকারে থাকে এবং বাস্তব সমাজে তাদের মধ্যে কে কোন ভূমিকায় থাকবেন, সে বিষয়ে তাঁরা যদি অনিশ্চিত থাকেন, তাহলে তাঁরা সমাজ (বা রাষ্ট্র বা অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান) পরিচালনার জন্য যে নীতির বিষয়ে একমত হবেন, আশা করা যায় যে সেই নীতিটি সবার জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করবে। কেননা, কেউ জানবেন না যে তিনি বাস্তবে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। তিনি কি ক্ষমতাবান হিসেবে আবির্ভূত হবেন, নাকি ক্ষমতাহীন? তিনি কি নারী হিসেবে থাকবেন, নাকি পুরুষ? তিনি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে থাকবেন নাকি সংখ্যালঘু? এমন পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক যে তাঁরা এমন বিষয়ে একমত হবেন, যেগুলো সব সদস্যের, সব পক্ষের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এখানে তাঁরা যে নীতির ব্যাপারে একমত হবেন, সেটা হবে ন্যায্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত নীতি।

জন রাউলসের মতো লালনও এমন এক অবস্থায় চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে যুক্তির প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। যদি এমন কোনো আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, যেখানে মানুষের সম্ভাব্য সব রকম চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব একটি সক্ষম এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে এবং সেই কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার বিষয়ে যদি সাধারণভাবে জানা থাকে, তাহলে মানুষ জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য আর কোনো তাগিদ অনুভব করবে না। সে ক্ষেত্রে মানুষের যে যুক্তিশীল অংশ থাকে, তার কাজ কী হবে? সাধারণভাবে, যুক্তিশীল অংশের কাজ হবে শুধু যুক্তিশীলতার চর্চা করা। কেননা, জৈবিক প্রয়োজনে যুক্তিশীলতার চর্চা সেখানে নিষ্প্রয়োজন (কারণ, আমরা ধরেই নিয়েছি যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সকল চাহিদা পূরণ করবে)। সে জন্য

যুক্তি শুধু যুক্তিশীলতার চর্চাই করবে। লালন দেখাতে চান, যুক্তি যদি শুধু যুক্তিশীলতার চর্চাই করে এবং প্রবৃত্তিতাড়িত না হয়, তাহলে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ সম্ভাব্য কোন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে? লালন সেই সিদ্ধান্তকেই সাধারণভাবে সবার ওপর প্রযোজ্য বলে মনে করছেন। লালন দেখিয়েছেন যে মাতৃগর্ভে প্রতিটি মানুষ এমন এক অবস্থায় থাকে, যেখানে তার বেড়ে ওঠার, বিকশিত হওয়ার সব শর্ত প্রাকৃতিকভাবে পূরণ হয়। এটি একটি আদর্শ অবস্থা, যেখানে কোনো জাগতিক চাহিদা, প্রবৃত্তির তাড়না বা অন্য কোনো চাপ অনুপস্থিত। মাতৃগর্ভে একটি মানবশিশু তার ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সম্ভাব্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে—সেটা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়; কারণ, সে জানে না, যে পরিস্থিতিতে সে জন্মাবে, সে পরিস্থিতি তার জন্য কী কী সুযোগ সৃষ্টি করবে কিংবা কী কী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে। তবে সাধারণভাবে এতটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে তার জীবনটাকে সে আন্তরিকভাবে নেবে; জীবন তাকে যে সুযোগগুলো দেবে, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবে আর নিজের সক্ষমতাকে ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে শ্রেয়তর অবস্থানে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এটিই হবে তার সাধনা। আর এর জন্যই সে নিজের সঙ্গে নিজে চুক্তিবদ্ধ হয়। আমরা সবাই সে অর্থেই একটি চুক্তি করে পৃথিবীতে এসেছি। তাই লালনের চুক্তি সর্বজনীন। দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে এ চুক্তি সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই চুক্তির মাধ্যমে 'হিউম্যান ডাইমেনশন অব ফ্রি কনডাক্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মানে হলো স্বাধীনতা আনবাউন্ড। তবে এই চুক্তির নৈতিক দিকটি হচ্ছে, লালন ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ বা জীবনের লক্ষ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করছেন না। বরং ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন তার নিজের ব্যাপারে খেয়াল রাখার জন্য। এই চুক্তির ফলে মানুষের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে যায় না। বরং মানুষের নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা—দুটোই অবারিত হয়।

লালন জন্ম-মুহূর্তে মানবশিশুর জন্য যে চুক্তির কথা আমাদের সামনে হাজির করলেন, সেটিও মূলত চেতনার দিক থেকে রাউলসীয়। অথবা রাউলস যে প্রকল্পের মাধ্যমে সবার জন্য প্রযোজ্য ন্যায্য-নীতি হাজির করলেন, সেটি চেতনার ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে লালনীয়। কেননা জন্ম-মুহূর্তে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না; জন্ম নিতে যাওয়া শিশুটি জানে না, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সে পতিত হবে। ফলে সেই মুহূর্তে সে যে বিশেষ নীতির বিষয়ে একমত হবে, সেটি হবে সর্বজনীন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, লালনের দ্বিতীয় চুক্তির মৌলিক সিদ্ধান্ত হলো, জীবনের লক্ষ্য হবে সাধনা। সাধনাতেই জীবনের সার্থকতা। আজীবন সাধনার নামই সাফল্য। এই সাধনার ধরন হলো উন্মুক্ত। আর সাধনার বিষয়ে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া চলবে না। শাস্ত্রে কোনো নীতি বা মতাদর্শের রূপরেখা থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেই শাস্ত্রকথা কখনো চূড়ান্ত নয়। অলঙ্ঘনীয় নয়। কেননা, শাস্ত্র নিজেকে নিজে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে না। মানুষই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে এবং সেই ব্যাখ্যা থেকে কর্তব্য নির্ধারণ করে। ফলে শাস্ত্রই যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা তো শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রপূজা হয়ে ওঠে। তখন গাছ-কাঠ-পাথর পূজা আর শাস্ত্র পূজার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। এই সাধনার দ্বারাই মানুষ প্রতিনিয়ত তার বর্তমান মুহূর্তের, বর্তমান বাস্তবতার এবং বর্তমানে প্রচলিত নৈতিকতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যালোচনা জারি রাখবে। এর ফলে সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে বুদ্ধিজাত নৈতিকতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বজায় থাকবে। ফলে সমাজ হবে গতিশীল। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে লালন বঙ্গীয় জনপদে 'চুক্তিবাদী বুদ্ধিজাত নৈতিকতা'র প্রবক্তা। লালনের চুক্তির প্রধান অনুসিদ্ধান্ত হলো, একজন মানুষকে অন্য কোনো মানুষ শর্তের অধীন করতে পারে না। শুধু স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতেই একজন মানুষ নিজের ওপর শর্ত আরোপ করতে পারে; অন্যের ওপর নয়। এখানে মানুষ নিজেই নিজের জীবনের দায়িত্ব নেয়। এর ফলে মানুষের অন্তর্গতভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পশ্চিমা সামাজিক চুক্তির ফলে তৈরি হয় এক রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্র। তৈরি হয় এমন এক কর্তৃপক্ষ, যার থাকে অন্যের ওপর জবরদস্তি করার বৈধতা। যেহেতু জবরদস্তির বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর, তাই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বলয়টাও সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার তাগিদ থাকে। আর লালনের চুক্তির দুটি অংশ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমটি সামাজিক ও অন্যটি ব্যক্তিগত। লালনের সামাজিক চুক্তির ফলে কোনো প্রকার সংগঠন তৈরি হয় না। এই চুক্তির ফলে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি বিশেষ বাস্তবতার নিরিখে কিছু 'করণীয়' ও 'বর্জনীয়'র তালিকা তৈরি হয়। এখানে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা জবরদস্তিমূলক সংগঠন (বা কর্তৃপক্ষ) তৈরি হয় না। পশ্চিমা চুক্তির জবরদস্তিমূলক দিকটির কারণে কোন কোন শর্ত পূরণ হলে জবরদস্তির প্রয়োগ ন্যায্য, আর কখন সেটা অন্যায্য, সেসব ব্যাপারে প্রতিনিয়ত সবাইকে সজাগ থাকতে হয়। আর তাই পশ্চিমা চুক্তির শর্তগুলো নবায়নের ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে লালনের চুক্তির ব্যক্তিগত অংশটি নৈতিক ও

পর্যালোচনাধর্মী। এখানে ব্যক্তি যখন পর্যালোচনাকে জারি রাখে, তখন লালনের চুক্তির সামাজিক অংশটির আপনা-আপনিই নবায়ন হয়। তখন নবায়ন হয় একটি সহজ-স্বাভাবিক অনায়াসপ্রসূত বিষয়। ফলে লালনের সামাজিক চুক্তিতে নবায়নের ব্যাপারটা মুখ্য হিসেবে থাকে না।

উপসংহার

পশ্চিমা চুক্তিবাদী তত্ত্বের বিপরীতে লালনকে যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে স্পষ্ট হবে যে লালন মূলত দুই স্তরবিশিষ্ট চুক্তিকে আমাদের সামনে হাজির করছেন। প্রথম চুক্তিটি হলো সামষ্টিক (এবং সে অর্থে সামাজিক), আর এর ফল হলো সামাজিক নৈতিকতা, পাপ-পুণ্যের ধারণা। আর এগুলো আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করে বিভিন্ন সামাজিক (কখনো রাষ্ট্রীয়) প্রতিষ্ঠান। সামষ্টিক চুক্তিটির বিষম-ফল বিভিন্ন রূপে মানুষের ওপর চেপে বসে, যদি মানুষ দ্বিতীয় চুক্তিটির ব্যাপার অষ্টপ্রহর সচেতন না থাকে; সেটি হলো ব্যক্তিগত চুক্তি। জন্মমুহূর্তের চুক্তি। মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত চুক্তির ব্যাপারে সচেতন থাকে, তখন সামাজিক চুক্তির ফলাফল তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু ব্যক্তিগত চুক্তির ব্যাপারে আত্মভোলা হলে পরিণামে সে পর্যালোচনাহীন হয়ে পড়ে এবং এর ফলে খোদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি মানুষের ওপর চেপে বসে। লালনের চুক্তি তাই যুগপৎ সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত। এখানে ব্যক্তি স্বমহিমায় হাজির থাকেন। দুই দিক থেকে এটি পশ্চিমা সামাজিক চুক্তি মতবাদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত: প্রথমত, এটি দেশজ (অর্গানিক), এর জন্য কোনো আদি অনুমান প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, এটি স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে জবরদস্তি অনুপস্থিত।

তথ্যসূত্র

১. Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, GDH Cole Translation, 1762.
২. Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, Oxford: Blackwell, 1999.
৩. Marcus George Singer, 'The Ideal of a Rational Morality', *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Assoication*, Vol. 60, No. 1, 1986, p. 16.

৪. Jeremy Bentham, *Fragment on Government*, Preface to First Edition.
৫. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২, পৃ. ১৮৭।
৬. আবদেল মাননান, *অখণ্ড লালনসঙ্গীত*, ঢাকা : রোদেলা, ২০১০, পৃ. ২৮১।
৭. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।
৮. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।
৯. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
১০. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
১১. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ২০১২, পৃ. ২০২।
১২. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩।
১৩. Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century, *History and Theory*, Vol. 44, No. 3, 2005, p. 474.
১৪. Marcus George Singer, *op. cit.*, pp. 16-17.
১৫. Marcus George Singer, *op. cit.*, p. 24.
১৬. Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Ehtics*, Rockville: Arc Manor, 2008, pp. 15-18
১৭. John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999 [1971].

চরণদাসী : লালন-নির্দেশিত ক্ষমতায়নের পথ

চাতকপ্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে কালো শশী
আমি হব বলে চরণদাসী...[১]

দাসী হব যুগল পদে/ সাধ মিটাব ঐ পদ সেধে[২]

কিংবা,

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী
ইতরপনা কার্য আমার ঘটে অহর্নিশি[৩]

আবার অনেক সময় স্পষ্ট করেই বলেন যে,

দাসী হতে চাই চরণে।[৪]

দাসী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, লালনের বাণীতে বারবার বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি, লালন তাঁর যুগে দাসপ্রথার কুফল প্রত্যক্ষ করেছেন। দাসপ্রথার অমানবিক দিক বিবেচনা করেই হোক বা অনুৎপাদনশীল দাসদের মুক্ত করে মুক্ত মানুষদের আরও বেশি অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল করার তাগিদ থেকেই হোক, ১৮০৭ সালে বিলাতি ঔপনিবেশিক শাসনাধীন অঞ্চলগুলোতে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দাসপ্রথা বিলোপ করা হয় ১৮৩৩ সালে। লালনের জীবদ্দশাতেই দাসপ্রথার আনুষ্ঠানিক বিলোপ ঘটলেও তিনি দাস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। লালনের আকাঙ্ক্ষিত দাসত্ব আর প্রাচীন গ্রিস-এথেন্স বা মধ্যপ্রাচ্যে চালু থাকা ধ্রুপদি দাসত্ব কি প্রকৃতিগতভাবে একই রকম? এই প্রবন্ধে আমরা ধ্রুপদি দাসত্ব থেকে লালনের 'দাসী' কতটা আলাদা, তা আলোচনা করব। আমাদের প্রস্তাব,

ধ্রুপদি দাসত্ব যেখানে মানুষকে নজিরবিহীনভাবে ক্ষমতাহীন করে, লালনের প্রস্তাবিত দাসত্ব মানুষকে অন্তর্গতভাবে ক্ষমতায়িত করে।

কে দাস?

ব্যক্তি যখন বস্তু হিসেবে গণ্য হন, তখন সেই ব্যক্তিকে দাস এবং তার অবস্থা ও অবস্থানকে দাসত্ব বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে, বস্তুর ওপর মানুষ যেমন নিজের মালিকানা আরোপ করে—বস্তুকে অধিকার করা যায়, হস্তান্তর করা যায়, ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়—ঠিক তেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যের মালিকানা আরোপ করা যায়, তখন যার (বা যাদের) ওপর মালিকানা আরোপ করা হলো, তাকে (বা তাদের) আমরা দাস বলি। আর তার অবস্থাকে বলি দাসত্ব।[৫] দাসত্বের মূল বৈশিষ্ট্য মূলত তিনটি। প্রথমত, দাসত্বের ফলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার (ফ্রি উইল) বিসর্জন ঘটে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির নিজের শ্রমক্ষমতা অন্যের দ্বারা অধিগৃহীত হয়। এবং তৃতীয়ত, শ্রমের এই অধিগ্রহণ জবরদস্তি প্রয়োগের হুমকির ফলে ঘটে থাকে।[৬] যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে এবং নিজের শ্রমকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার (বা বিক্রি করবার) অধিকার ত্যাগ করার জন্য তার ওপর বল প্রয়োগ করা হয় বা প্রয়োগের হুমকি দেওয়া হয়, তখন ওই ব্যক্তির অবস্থাকে আমরা দাসত্ব বলব।

দাসপ্রথা

প্রচলিত ধারণা হলো, ভারতে—বিশেষ করে বাংলায়—দাসপ্রথার প্রকোপ গ্রিস বা এথেন্সের চিরায়ত দাসপ্রথার মতো ততটা তীব্র ছিল না। এ ব্যাপারে একটু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতে দাসপ্রথা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ১৭৭৪ সালে ভারতে প্রচলিত হিন্দু আইনের কিছু অংশ অনুবাদ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের দপ্তরে পাঠানো হয়। সেখানে লেখা ছিল, 'দাসের সন্তান হবে দাস; কোনো মূল্য দিয়ে যাকে কেনা হবে, সেও হবে দাস; কোথাও কাউকে হঠাৎ পাওয়া গেলে সে হবে দাস; দাস-মালিকের উত্তরাধিকারীরা পাবেন দাস। আর দাসত্ব থেকে মুক্তি মিলবে কেবল মালিকের ইচ্ছায়।'[৭]

জেমস পেগসের মতে, ঢাকায়ও দাসপ্রথা ছিল। ঢাকা অঞ্চল থেকে বহু শিশুকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো। কেউ আবার তাদের সন্তানকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিত, কেউ কেউ এমনি দিয়ে দিত।[৮] বাংলা থেকে যাদের ধরে বা কিনে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদের সাধারণত শ্রীলঙ্কায় বিক্রি করা হতো। পেগসের মতে, শ্রীলঙ্কা ছিল বাংলার দাসদের একটি বাজার। তিনি আরও লেখেন যে ১৭৮৯ সালে জনৈক ক্যাপ্টেন হরিবো বাংলা থেকে ১৫০ জন শিশুকে কিনে নিয়ে এক ইংরেজ জাহাজে ওঠেন এবং কলম্বো নিয়ে গিয়ে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেন।[৯] বাংলা থেকে দাস যেমন অন্যত্র যেত, ঠিক তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বাংলায় দাস আনা হতো। সিরাজুল ইসলাম লেখেন যে আঠারো ও উনিশ শতকে আফ্রিকা, আরব, মালয়েশিয়া, চীন, আরাকান, আসাম ও নেপাল থেকে বাংলায় দাস আমদানি করা হতো। আরব থেকে যাদের আনা হতো, তাদের বেশির ভাগই ছিল খোজা।

বাংলায় সাধারণত দুই ধরনের কাজে দাসরা নিয়োজিত থাকত : ঘর-গেরস্থালিতে এবং কৃষিকাজে। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে দাস থাকবে, এটা ছিল প্রত্যাশিত। জমিদারদের তো বটেই, মধ্যবিত্ত বা সম্পন্ন কৃষকদেরও দাস ছিল। হিন্দু দাস-মালিকেরা তাঁদের দাসদের আবার বর্ণ অনুযায়ী ভাগ করতেন এবং আলাদা আলাদা রাখতেন। মুসলিম পরিবারে পুরুষ দাসদের নফর বা গোলাম আর নারীদের বান্দী বা লুন্দি হিসেবে ডাকা হতো। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের দাস-মালিকেরাই যৌনতা চরিতার্থ করতেন তাঁদের সুশ্রী দাসীদের সঙ্গে। সিরাজুল ইসলাম লেখেন যে প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত কৃষিদাসপ্রথা বাংলার কৃষিব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল? সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলায় কৃষিদাসত্ব ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। ১৮৩৯ সালের আইন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এসব জেলার প্রতি পাঁচজনে একজন কৃষিদাস ছিল। কৃষিদাসদের সঙ্গে অন্য দাসদের একটু তফাত আছে। অন্য দাসদের হাট থেকে কেনা হতো। আর কৃষিদাসেরা ছিল মূলত পরিস্থিতির শিকার। অভাব, বন্যা, খরা, নদীভাঙন বা পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যু—এসব কারণে বাঁচার তাগিদে কৃষিদাসেরা অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে আশ্রয় প্রার্থনা করত।[১০]

এখন কথা উঠতে পারে, বাংলায় দাসপ্রথা ধ্রুপদি দাসপ্রথা—অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিস ও এথেন্সে যে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল, তা থেকে কতটা পৃথক ছিল। কিংবা এদের মধ্যে মিলই-বা কতটুকু ছিল? গ্রিসে দাসপ্রাপ্তির উপায় ছিল

চারটি : যারা দাসের সন্তান, তারাও মালিকের দাস; যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, তারা দাস; যাদের কেনা হয়েছে, তারা দাস; আবার যারা ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারাও দাস। বাংলায়ও এসব কারণেই মানুষকে দাসত্ব বরণ করতে হতো। তবে একটা ব্যাপারে ভিন্নতা ছিল : রাস্তায় কাউকে কুড়িয়ে পেলে তাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার অধিকার এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা ছাড়া দাসদের ঘর-গেরস্থালিতে, কৃষিতে বা যৌনতায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিস-এথেন্স, মধ্যপ্রাচ্য বা বাংলায় তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

দাসদের সঙ্গে তাদের মালিকের সম্পর্ক কেমন হবে? ভিক্টোরিয়া কাফেল লেখেন, দাসদের বিবেচনা করা হতো তাদের মালিকদের ব্যক্তিত্বের বিস্তার বা এক্সটেনসান হিসেবে। দাসদের বাধ্য থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, দরকার হলে শাস্তি দিয়ে। মালিকের সঙ্গে দাসের সম্পর্ক ছিল একনায়কসুলভ বা টাইরেনিক্যাল। সে সম্পর্কে বন্ধুত্ব থাকার ব্যাপারটা একেবারেই প্রশ্নাতীত। আনুগত্য এবং একমাত্র আনুগত্যই একজন দাসের কর্তব্য। আনুগত্যই দাসের একমাত্র সদ্‌গুণ। যদিও মানুষ হিসেবে কিছু বোধ-বুদ্ধি সবারই থাকে, তারপরও দাসদের ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ, কিংবা জ্ঞান, ন্যায্যতাবোধ ইত্যাদি সদ্‌গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; বরং মালিকের হুকুম যথাযথভাবে তামিল করাই হলো তার একমাত্র সদ্‌গুণ। দাসের মন বলতে কিছু নেই, মনের সুখ সে কারণে স্বীকৃত নয়। সে কেবল শারীরিক আনন্দ পেতে পারে। এককথায়, মালিকের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য দাস একটা পোষা প্রাণীর চেয়ে একটু উন্নততর ধরনের প্রাণী ছিল।[১১] দার্শনিক হানা আরেন্ডট সে কারণেই হয়তো দাসদের ওপর দাস-মালিকদের অধিকারকে দুনিয়ার সবচেয়ে চরম স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব বলে অভিহিত করেছেন।[১২]

প্রাচীনকালে এমন কোনো স্বাধীন ও সভ্য সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে সত্যিকার অর্থে দাসত্ব ছিল না। গ্রিস ও এথেন্সের দাসপ্রথা বিষয়ে কিংবা আরবের দাসপ্রথা সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানি। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচুর্যও দাসনির্ভর ছিল বলে আমরা এখন জানতে পারি। প্রাচুর্যের সঙ্গে দাস-ব্যবস্থার অনিবার্যতা বিষয়ে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস লেখেন, দাস-ব্যবস্থার কারণেই বড় পরিসরে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রথম শ্রমবিভাজন করা সম্ভব হয়েছে।...আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে আমাদের গোটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির মূলে ছিল

এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে দাসপ্রথা ছিল নেহাত একটি প্রয়োজন। আর বিষয়টা ছিল সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।[১৩] আর সে জন্যই হয়তো প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, মধ্যযুগের আরব সভ্যতা, এমনকি প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সভ্যতায়ও দাসপ্রথা ছিল সমাজের একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এঙ্গেলসের কাছেও তাই দাসব্যবস্থাকে একধরনের আবিষ্কার মনে হয়েছে। আর নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যই থাকে 'মানুষের' শ্রমের কষ্টকে লাঘব করা। নব-আবিষ্কৃত দাসপ্রথার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

লালন কেন দাস হতে চেয়েছেন

লালনের আজীবন আকাঙ্ক্ষা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার নয়, বরং দাস হওয়ার। তিনি বলেন, 'গৌরের সঙ্গে যাবি দাসী হবি/ এইটা মনে কর বাসনা।'[১৪] যে দাসত্ব মানুষকে মানবিকতার স্তর থেকে যন্ত্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেয় এবং অন্যের ইচ্ছার বশংবদ করে রাখে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে একেবারে অস্বীকার করে, লালন সেই দাস কেন হতে চেয়েছেন? এর কারণ লালনের কালামে বিভিন্নভাবে আছে। যেমন :

মাকাল ফলের রূপ দেখে
সদাই যেমন নাচে কাকে
তেমনি মন মোর চটকে বিভোর
সার পদার্থ নাহি চেনে।
মন মোর গুণ জানা গেল
পিতল কিনে সোনা বল।[১৫]

তিনি যেসব বস্তু বা বিষয়কে মূল্যবান মনে করে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেগুলো মূল্য পাওয়ার যোগ্য নয় বলে তিনি অনুভব করছেন। একই সঙ্গে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে চারপাশের জটিল বাস্তবতার সঠিক পাঠটি তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার নিত্যদিনকার জীবনও কখনো কখনো তাঁর কাছে অর্থহীন ও মায়া বলে মনে হয়।

দেখলাম এ সংসারে ভোজবাজি প্রকার
দেখতে দেখতে অমনি কেবা কোথা যায়।
মিছে এ ঘর-বাড়ি মিছে ধন টাকা-কড়ি
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়।[১৬]

এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সমস্ত আয়োজনকে অলীক ও অর্থহীন মনে হয়।

লালন উপলব্ধি করতে পারছেন যে তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। এই শিক্ষার জন্য তো শাস্ত্রই রয়েছে। শাস্ত্র এস্তেমাল করলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। কেননা, শাস্ত্রগুলোকে—তা ঈশ্বরের রচনাই হোক আর মানুষের রচনাই হোক—তো সব যুগেই জ্ঞানের আকর বলে বিবেচনা করা হয় (ধর্মবাদীদের অবলম্বন ধর্মশাস্ত্র, আর অন্যদের অবলম্বন পণ্ডিত-রচিত শাস্ত্র)। এখানেই লালনের আপত্তি, 'বেদ পড়ে ভেদ পেত যদি সবে/ গুরু গৌরব থাকত না ভবে'।[১৭] তাঁর মতে, শাস্ত্রের গুরুত্ব আছে বটে, কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার প্রয়োগযোগ্য সমাধান নিশ্চিত করতে শাস্ত্র অক্ষম। কেননা, শাস্ত্রে তো শুধু 'কথা' বা 'বাক্য' লেখা থাকে। শাস্ত্র তো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আর শাস্ত্র-কথা তো বটেই, যেকোনো কথার অর্থই পরিস্থিতিনির্ভর। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন তিনি মৃদু হেসে বললেন, এত তাড়াতাড়ি? শিক্ষকের এই কথার মানে কী? তিনি কি বুঝিয়েছেন যে এই শিক্ষার্থী সত্যি সত্যিই তাড়াতাড়ি এসেছে? নাকি বুঝিয়েছেন যে এই শিক্ষার্থী দেরি করে এসেছে? এই কথার মানে কি এই শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেল? যদি অনুমতিপ্রার্থী শিক্ষকের মৃদু হাসির অর্থ করে যে তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাহলে কি ভুল হবে? আবার সে যদি মনে করে যে প্রবেশের অনুমতি মেলেনি, তাহলে সে কি ভুল বার্তা পাবে? তার মানে বোঝা যাচ্ছে, 'এত তাড়াতাড়ি' বাক্যটির মধ্যে কোনো অর্থ নেই। এই অর্থ নির্ভর করে ইতিহাস, পরিস্থিতি, পাত্র-পাত্রী ইত্যাদির ওপর। এখন, 'এত তাড়াতাড়ি' বাক্যটি যদি কোথাও লেখা থাকে, তাহলে তার পাঠক কী বুঝবেন? তাহলে, আমরা বুঝতে পারছি যেকোনো বাণী বা বাক্যের অর্থ সংশ্লিষ্ট বাক্য বা বাণীর মধ্যে থাকে না। তার অর্থকে নির্মাণ করতে হয়। এই নির্মাণের কাজটি সামাজিক মানুষ করে থাকে। আর সেটাও আরেকটা শিক্ষার ব্যাপার। তাই তিনি বলেন, 'না জেনে করণ-কারণ কথায় কী হবে/ কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে?'।[১৮] ফলে জ্ঞানার্জন ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ণয়ে গুরুর নির্দেশনা দরকার। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শাস্ত্রচর্চা (বা নিজে নিজে পড়ালেখা) কাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে আসে না। যদি নিজে নিজে শাস্ত্রচর্চা করে জ্ঞানলাভ করা যেত, বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা যেত, তাহলে গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন দুনিয়াতে ফুরিয়ে যেত। অর্থাৎ, গুরু বা শিক্ষকের সাহায্যে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ সম্ভব। তা ছাড়া, জটিল বাস্তবতার

গভীরে যদি কোনো গূঢ় সাধারণ সূত্র থাকেও, তাকে আবিষ্কার করার জন্য গুরুর সাহায্য লাগবেই বলে লালন আমাদের জানাচ্ছেন, 'গুরু বিনে সন্ধান কে জানে/ সে ভেদ জাহের নয় তা বাতেনে'। লালন যেন সুরে সুরে সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের কথাটিই বলতে চেয়েছেন : সমাজবাস্তবতাকে আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও তা আসলে সরল নয় (social life is not as simple as it first seems)।[১৯] আর মানুষের মনের ব্যাপারটা তো এমনিতেই জটিল। ফলে নিজেকেও যদি জানতে বুঝতে হয়, তারপরও প্রশিক্ষক দরকার। লালন বলেন, 'আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন/ গুরু তুমি বৈদ্য সচেতন/ চরণ দেখবে আশায় কয় লালন/ জ্ঞান-অজ্ঞান দেও নয়নে'।[২০] অর্থাৎ লালন অধম। নির্গুণ। কিন্তু গুণ অর্জন করতে চান। নিজেকে চিনতে চান। সমাজবাস্তবতাকে বুঝতে চান। তাই তিনি 'গুরু'র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছেন। এই গুরু তাঁকে করণ-কারণ শিক্ষা দেবেন। তাঁর জ্ঞানচক্ষু তৈরি করবেন। ফলে অন্ধ-বধির লালন দেখতে ও শুনতে পারবে।

তাহলে লালনের মতে, গুরুর কাজ কী? 'গুরু'র প্রথম কাজ হলো : শিষ্যকে চক্ষুদান। ফলে শিষ্য দেখতে পাবেন। শিষ্য নিজেকে স্বরূপে দেখবেন। সমাজ-সংসারকে দেখবেন। লালন বলেন :

গুরুকৃপা বলে কোন ভাগ্যবান
দেখেছে সে রূপ পেয়ে চক্ষুদান।[২১]

গুরুর দ্বিতীয় কাজ হলো শিষ্যকে উপযুক্ত জ্ঞান দান করা। ফলে শিষ্যের ভবযন্ত্রণা দূর হবে। শিষ্য তাঁর স্বীয় কর্তব্যকর্মে স্থির হবেন। সুখী হবেন। লালনের ভাষায় :

গুরু গো মনভ্রান্তি যায় না সংসারে
মন ভ্রান্ত কর শান্ত, শান্ত হয়ে রই ঘরে।[২২]

এমনকি কেউ যদি নিজেকেও জানতে-চিনতে চায়, আত্ম-রূপদর্শন করতে চায়, সে ক্ষেত্রেও গুরুর সাহায্য প্রয়োজন।

গুরু ধর খোদকে চেন
সাঁইর আইন আমলে আনো।[২৩]

আর শিষ্য যখন আত্মতত্ত্ব জানবে, নিজেকে চিনতে পারবে, দৃশ্যমান সামাজিক বাস্তবতার আড়ালে যে গভীরতর বাস্তবতা আছে, তার সূত্রগুলো ধরতে পারবে, তখন সব সমস্যার সহজ-স্বাভাবিক সমাধান তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন শিষ্য তার নিজের জীবনের এবং তার চারপাশের প্রকৃতি-প্রতিবেশ সবকিছুর দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়ে উঠবে। লালন তাই

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন :

পুসিদার ভেদ জানতে পারলে
নবুয়ত তার আপনি মেলে
কেতাব-কোরানে না পাইলে
দেল-কোরানে সব পাবে।[২৪]

অর্থাৎ গুরুর কাছ থেকে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করার পর শিষ্য নিজেই স্বয়ম্ভু হয়ে উঠবেন। আর শিষ্যের সাধনা তাই স্বয়ম্ভু হবার সাধনা। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিষ্য নিজেকে গুরুর হাতে সঁপে দেন। গুরুর অধীনে দাস হন। দাস যেমন নেহাত অন্যের যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, শিষ্যও তেমনি গুরুর হাতের যন্ত্রে পরিণত হন। লালনের কালামে শিষ্যের যন্ত্রবৎ হাজির থাকার ব্যাপারটি বারবার ঘুরেফিরে আসে।

যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যে বোল বাজাও বাজে তেমন
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।[২৫]

আবার অন্যত্র তিনি বলেন :

গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।[২৬]

লালন তাই গুরুপদে নিষ্ঠ হতে চান। গুরুর চরণে দাস হতে চান। সন্দেহ নেই যে এই গুরু রক্ত-মাংসের মানুষ; সমাজের কাছে তিনি আর দশজনের একজন মাত্র; কিন্তু শিষ্যের কাছে তিনি মানুষ নন। শিষ্যের কাছে তিনি জ্ঞানের প্রধানতম অবলম্বন। লালন বলেন :

গুরু বিনে কি ধন আছে
কী ধন খুঁজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে!!
বিষয়-ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই।[২৭]

আর তাই লালনের আক্ষেপ যে তিনি গুরুর মূল্য সময়মতো বুঝতে পারেননি। 'সময় ছাড়িয়া জানিলাম এখন/ গুরু কৃপা বিনে বৃথা এ জীবন'[২৮]; চিনলাম না রে গুরু কী ধন/ না করলাম তার সেবা সাধন'।[২৯] সে জন্য গুরুকে অন্যরা মানুষ মনে করলেও শিষ্য তাঁকে মনুষ্য-জ্ঞান করবেন না;

শিষ্যের কাছে তিনি পরম পুরুষ; তিনিই জ্ঞানের আধার; তিনিই অবতার, তিনিই মুর্শিদ। লালন বলেন :

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপতে গতি জ্ঞান যার।[৩০]

আর যিনি অবতার, জ্ঞানের আধার, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে শিষ্য নিজেকে ক্ষমতাহীন করেন না; শিষ্য গুরুতে সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, লালনের কালাম যেন গুরুবন্দনার এক দলিল। প্রশ্ন আসতে পারে, এই গুরুবন্দনা কি লালনের বিশেষত্ব? না; এটি এই অঞ্চলের সব ধরনের (জ্ঞান)চর্চার বিশেষত্ব। বাংলায়, এমনকি ভারতীয় চর্চায়, গুরুবন্দনা নতুন কিছু নয়। হিন্দু, সহজিয়া, তান্ত্রিক ও সুফি ঘরানায় গুরু বিশেষ মর্যাদায় আসীন। লালন সেই গুরুনির্ভর সাধনার ব্যাপারে তাঁর আস্থাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন তাঁর কালামে। ব্যক্তিগত বা সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য লালন বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোর প্রস্তাব করেননি। বরং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য লালনের কালাম খুঁজে যে প্রতিষ্ঠানের বিবরণ আমরা পাই, সেটি হলো গুরু নিজে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'গুরু' প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও হাজির ছিলেন। শিক্ষক বা ওস্তাদ বা দীক্ষা-প্রদানকারী হলেন গুরু। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদিকাল থেকেই 'গুরু' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় আসীন। বৈদিক যুগেও 'গুরু'কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হতো। তান্ত্রিক হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে গুরুর ভূমিকা আজও মহিমান্বিত।

গুরু কেন বিশেষ মর্যাদায় আসীন? এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে উপমহাদেশের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ঐতিহ্য থেকে। এখানে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ছিল বচন ও শ্রুতিনির্ভর। কথানির্ভর। লেখা এবং পড়া নির্ভর নয়। ফলে গুরুর মুখনিঃসৃত কথা কানে শুনে স্মৃতিতে ধারণ করার চর্চা ছিল অনেক দিন যাবৎ। তাই কাগজে বা অন্য কোনো বস্তুতে লিখে ও পরে পড়ে শিক্ষা লাভ এই অঞ্চলে ততটা প্রাধান্য পায়নি। অন্যদিকে বৈদিক যুগে যা কিছু 'দৈববাণী' হিসেবে প্রচলিত ছিল, তার কিছুই গ্রন্থবদ্ধ ছিল না। প্রাথমিক যুগে গোটা বেদই ছিল শ্রুতি-স্মৃতিনির্ভর। বৌদ্ধ ও জৈন গুরুরা মুখে মুখে তাঁদের অনুসারীদের শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষাকে স্মৃতিতে ধারণ করতে হতো। আর তাই ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হলো স্মৃতি। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে সর্বোচ্চ জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। সত্য মানুষকে পথ দেখাতে পারে। আর জ্ঞান ও সত্যকে পেতে গুরুর সাহায্য বা

আশীর্বাদ লাগবেই। কেননা, সর্বোচ্চ জ্ঞান ও নিখাদ সত্য বিষয় হিসেবে গূঢ় ও গোপন। আর এ শিক্ষা গুরু তাঁদেরই দেন, যাঁদের এ জ্ঞানকে ধারণ করার সামর্থ্য আছে। অনেক ক্ষেত্রে এটাও ধরে নেওয়া হয় যে, গুরু অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। অন্য কেউ যদি সেই অতিমানবিকতায় অধিগমন করতে চান, তাহলে গুরুর সাহায্য লাগবে; কেননা, যিনি সেই ক্ষমতার অধিকারী, তিনি তা অন্যকে দেখাতে ও অন্যের মাঝে সঞ্চার করতে পারবেন। এই কারণেও গুরুকে স্বর্গীয় বিবেচনা করা হয়। লালন বলেন, 'যিনি নবী তিনি রাসুল, মুর্শিদ সেই হয়'।

শুধু তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সব ধর্মমতেই গুরুকে—তা তিনি জীবিতই হোন আর মৃতই হোন, তাঁর শিষ্যরা স্বর্গীয় বিবেচনা করেন। জোয়েল ম্লেকো আমাদের জানান, হিন্দুরীতিতে কোনো অনুত্তম ব্যক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে [অর্থাৎ পরমকে] বোঝা যাবে না; কারণ, তাঁকে বিচিত্রভাবে পাওয়া যায়, চিন্তা করা যায়, অনুভব করা যায়। যিনি পরমকে নিজের মধ্যে জানেন তাঁর কাছ থেকে পরমকে উপলব্ধি করতে শিখতে হবে; কেননা, পরম অধরা, তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর।[৩১] তা ছাড়া উপনিষদে বারবার নিজে নিজে শেখার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এমন প্রচেষ্টা নিষ্ফল। এমনকি শাস্ত্রে সবকিছু লেখা থাকলেও লিখিত শাস্ত্র নিজে নিজে চর্চা করেও চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় বলে উপনিষদ আমাদের জানায়।[৩২] জোয়েল ম্লেকো হিন্দুরীতিতে গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা দেন এভাবে: গুরুর যেহেতু গভীরতর বাস্তবতার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দুটোই আছে, তাঁর আসলে সবকিছুই আছে। তাঁর অন্য কোনো কিছুরই দরকার নেই। সে জন্য তিনি কামনা-বাসনাবিহীন। সে জন্য তিনি অর্জনের প্রলোভন থেকে মুক্ত; একই সঙ্গে মুক্ত পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা থেকেও। যদিও তাঁর বস্তুগত সম্পদ নেই বললেই চলে, তারপরও তিনি দাতা। তিনি দয়াল, প্রেম ও করুণার আধার। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি মনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সাহায্যকারী।[৩৩] কুলের নবতন্ত্রের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গুরুর মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর কয়েকটি নিচে উল্লেখ করছি:[৩৪]

> **১২: ১৩-১৪:** ধ্যানের মূল হলো গুরুরূপ, পূজার মূল হলো গুরুপদ; মন্ত্রের মূল হলো গুরুবাক্য; মুক্তির মূল হলো গুরুর আশীর্বাদ। হে কুলবতী! গুরু জগতের সব কিছুর মূল। সুতরাং ভক্তিভরে গুরুর সেবা করো অবিরত।

১২ : ১৫ : যে ভক্তিসহ গুরুতে নিষ্ঠ হবে না সে ভয়, বেদনা, নির্বুদ্ধিতা-বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও পাপাচারে আক্রান্ত হবে।

১২ : ১৬ : মানুষ যতক্ষণ সদ্‌গুরুতে নিষ্ঠ না হবে ততক্ষণ সংসারে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, সকল ধরনের বিভ্রম ও যাতনার শিকার হবে।

১২ : ৪৬ : গুরু পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই ঈশ্বর—সর্বেসর্বা। যখন শিব অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন তখন গুরু রক্ষা করেন; আর গুরু অগ্নিমূর্তি হলে রক্ষা করার কেউ নেই।

১২ : ৪৭ : যে চিন্তায় বা বাক্যে গুরুকে সাধারণ মানুষের মতো বিবেচনা করবে, তার সমস্ত পুণ্য কাজ পাপে পরিণত হবে।

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক

শিষ্য গুরুর দীক্ষা গ্রহণ করবেন, তাঁর চরণে দাস হবেন—এসব বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাহলে, প্রাচীন গ্রিস-এথেন্স-ভারতে প্রচলিত দাস-ব্যবস্থার সঙ্গে লালনের দাসত্বের পার্থক্য কোথায়? আমরা দেখেছি যে দাস হলো মালিকের উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র; আর লালনও স্পষ্ট করেই বলেন যে শিষ্য হলেন গুরুর যন্ত্র আর গুরু হলেন যন্ত্রী। আপাতদৃষ্টিতে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। কিন্তু পার্থক্যটা আসলে গভীর। আর সে জন্যই লালন রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। প্রথমত, প্রশ্ন করা যায় : কে আগে? গুরু আগে, নাকি শিষ্য আগে? প্রশ্নটা অনেকটা 'ডিম আগে, নাকি মুরগি আগে'র মতো। কিন্তু লালন এই বিষয়টি দারুণভাবে স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন :

আমি সত্য না হইলে
গুরু সত্য কোন কালে।[৩৫]

অর্থাৎ গুরুর সত্যতা বা অথেনটিসিটির শর্ত হলো শিষ্যের সত্যতা। লালন বোঝাতে চেয়েছেন যে শিষ্য দীন-হীন কিংবা অধম রূপে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ-বুদ্ধি মূল্যহীন ও অকার্যকর নয়; বরং লালনের মতে সেগুলো কার্যকর এবং মূল্যবান। শিষ্য তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা, কূপমণ্ডূকতা সত্ত্বেও 'সত্য'কে ধারণ করেন; আর তার এই সত্যতাকে, তার ন্যূনতম জ্ঞানকে অস্বীকার করে চূড়ান্ত অর্থে কোনো সত্যকে আবিষ্কার করা যাবে না। আর শিষ্য যেহেতু 'সত্য'কে ধারণ করেন, সেই

সত্যকে অপরাপর সত্য দিয়ে চাপা দেওয়া বা ট্রাম্প (trump) করা বা নাকচ (nullify) বা ধ্বংস (destroy) করা যাবে না; তবে সযতনে লালন (nurture) করা যেতে পারে। সে জন্য, শিষ্যের মধ্যকার সত্যকে স্বীকার করে নিয়েই যেকোনো ধরনের সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। আলথুসার হয়তো এ কারণেই সাধারণ মানুষ যে মতাদর্শকে ধারণ করেন, তাকে ইল্যুশন (illusion) বা মোহ এবং একই সঙ্গে অ্যাল্যুশন (allusion) বা বাস্তবতার ইঙ্গিত বলেছেন। যদিও মতাদর্শের মধ্যে মোহ থাকে, সেই মোহের মধ্যে বাস্তবতাও মিশ্রিত থাকে। সেই মোহের বাস্তব উপাদানকে অস্বীকার করে সামাজিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে না। তাই লালন সাহসের সঙ্গে প্রচার করেন : আমি সত্য, সেহেতু আমার বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনা সত্য। আমার যুক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা সত্য, আমার সম্ভাবনা সত্য; একই সঙ্গে আমার সীমাবদ্ধতাও সত্য। আর এই সত্যগুলোকে স্বীকার করার মাধ্যমেই গুরুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্যের বোধ-বুদ্ধিতে শাণ দেওয়ার, শাণিত বুদ্ধিকে ব্যবহার করার, শিষ্যের যাবতীয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার, যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে উতরে যাওয়ার পথ গুরুর কাছে রয়েছে। সেগুলো শিষ্যকে গুরুর কাছ থেকে শিখতে হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুরুর আগে শিষ্য সত্য হিসেবে হাজির থাকেন। এবং শিষ্য তাঁর 'ক্ষুদ্রতর' বা 'হীনতর' সত্য থেকে বৃহত্তর ও মহান সত্য আবিষ্কারের পথে যাত্রা শুরু করেন গুরুকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয়জ্ঞান করে। 'আমি সত্য না হইলে/ গুরু সত্য কোন কালে'—লালনের এই অবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হলো : শিষ্য বা প্রশিক্ষণবিহীন মানুষ যতই 'হীন' বা 'অজ্ঞান' হোন না কেন, সত্যকে এবং সেহেতু গুরুকে চিনে নেবার সক্ষমতা তাঁদের আছে। এই সক্ষমতা মানুষের সহজাত এবং সে অর্থে সর্বজনীন। আর শিষ্যের (সাধারণ মানুষের) সম্ভাবনাকে আবিষ্কার ও প্রচার করার কারণে লালনের ভাবের পরিমণ্ডল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আর তাই শিষ্য ভক্তিভরে গুরুর চরণ-ছুঁয়ে থাকুক বা আনন্দে গুরুর কাঁধে উঠে থাকুক কিছু যায় আসে না। কেননা, গুরু প্রচলিত অর্থে 'দাস-মালিক' হয়ে থাকেন না; বরং দেহ ও মনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিষ্যকে আনন্দধামে পৌঁছে দেবার জন্য শিষ্যের সদাসঙ্গী হিসেবে হাজির থাকেন। গুরুর শিষ্য-নির্ভরশীলতার মাত্রা বোঝানোর জন্য জনৈক সাধককে উদ্ধৃত করে সুধীর বলেন, 'মুরিদ শামিল না হলে মুর্শিদ বোবা'।[৩৬]

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নৈতিক, রাজনৈতিক নয়

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্কের রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকলেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কখনো প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নয়। লালন এই সম্পর্ককে রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে নৈতিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন :

বাদশা গুরু গুরু বাদশা এসব কথা সাধুভাষা।
এ কথায় করে নিরাশা জীব পড়ে দুর্দশায় ॥[৩৭]

বাদশা হলেন আইন বা বিধানদাতা। তাঁর সঙ্গে অন্য মানুষের সম্পর্ক হলো জবরদস্তিমূলক (তা সেই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক বা স্বৈরতান্ত্রিক; গণতান্ত্রিক হলে সম্মতির ভিত্তিতে জবরদস্তির প্রয়োগ হবে এবং প্রকৃতিগতভাবে তা হয় সহনীয়, অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক হলে সম্মতির ব্যাপারটা গৌণ থাকে এবং জবরদস্তির মাত্রা তীব্রতর হয়)। কেননা, বাদশার সঙ্গে আমরা একমত হই বা না হই, তার বিধানকে বুঝি আর না বুঝি, বাদশার কথাই আইন। সবার জন্য সে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক (এমনকি সে আইন বদলানোর জন্য আবেদন-নিবেদন বা আন্দোলন-সংগ্রামও আইনমাফিকই করতে হয়)। তাই বাদশা গুরু নন।

আবার গুরুবাক্য আইন নয়। তবে গুরুবাক্য তখনই শিষ্যের কাছে আইন হয়ে ওঠে (বা আইনের মর্যাদা পায়), শিষ্য যখন জেনে-বুঝে 'গুরু'কে গুরু হিসেবে ভক্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের এই সম্পর্ক নৈতিক। কেননা, গুরু এবং গুরুবাক্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন উপযুক্তভাবে হচ্ছে কি না, সে জন্য শিষ্য নিজেই নিজের ওপর নজরদারি করবেন; এ জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। অন্যদিকে, বাদশার আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সেটা প্রযোজ্য নয়। বাদশার আরোপ করা বিধিবিধান ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত থাকেন।

এখন, বাদশা যদি কোনো কারণে গুরু হয়ে ওঠেন, তখন বাদশার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি এ ভক্তির উপযুক্ত নন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই রাজনৈতিক। অন্যদিকে, গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক নৈতিক ও আত্মিক। গুরুর সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কে, রাজনৈতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হলে তার পরিণাম কী হয়, সেটা অধুনা ভারত ও বাংলাদেশের পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতাদের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ফলে গুরুকে বাদশা এবং বাদশাকে

গুরু জ্ঞান করলে মানুষ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। আর লালনের উদ্দেশ্য হলো এর ঠিক উল্টো : মানুষের অন্তর্গত ক্ষমতায়ন। সে জন্য লালন বাদশা ও গুরুর সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক করছেন।

শিষ্যের গুরু নির্বাচন

এবার আসা যাক নির্বাচন বা বাছাইয়ের প্রসঙ্গে। কে কাকে নির্বাচন করবেন? গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করবেন, নাকি শিষ্য গুরুকে? নির্বাচনের বিষয়টা বেশ গণতান্ত্রিক (আর সনাতনী দাস-প্রথা থেকেও গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এ কারণেই পুরোপুরি আলাদা)। টুনটুন ফকির সরল ভাষায় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হলে যেমন বাবা একবার দেখে আসে, মা একবার দেখে আসে, বোন একবার দেখে আসে, পাড়া-প্রতিবেশী একবার দেখে আসে, তারপর তুমি নিজেও দু-একবার দেখে আসলে, তারপর না বিয়ে হয়। গুরুও এমন একটা জিনিস। ... হ্যাঁ, তুমি মিশবে যাকে তোমার ভালো লাগবে, তার সঙ্গে তুমি মিশে দেখবে যে ইনার কাছে কিছু পাওয়ার যোগ্য [আছে কি না] বা ইনি জ্ঞানের অধিকারী কি না।'[৩৮] শিষ্য প্রথমে গুরুর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন করবেন। আকুতি জানাবেন, 'আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী'[৩৯] কিংবা 'দাসী হতে চাই চরণে'[৪০]। শিষ্যের আবেদনে গুরু সাড়া দেবেন। ব্যাপারটা এমন নয় যে গুরু শিষ্য-শিকারে বের হবেন এবং শিষ্যকে আগে বধ করবেন, তারপর জবরদস্তির মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করবেন। ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে শিষ্যের দিক থেকে আসবে। শিষ্য স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুতে নিষ্ঠ হবেন। কারও অনুকরণ এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি বর্জনীয়। লালন সতর্ক করে বলেন, 'দেখা-দেখি করিলে যোগ/ ঘটবে বিপদ, বাড়িবে রোগ'।

সর্বজীব হয় গুরুজনা

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক কেমন হবে, তা আমরা আলোচনা করেছি। সমাজের আর দশজনের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটি কেমন হবে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'তাইতে বলি ওরে কানা সর্বজীব হয় গুরুজনা'।[৪১] আমরা জেনেছি, গুরুর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি হবে নৈতিকতার, ভক্তির। আইনের জবরদস্তি, স্বার্থের রাজনীতি বা রাজনীতির স্বার্থ এখানে অনুপস্থিত থাকবে। আর সমাজের

অন্য সদস্যদের সঙ্গেও একই ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার পরামর্শ দেন লালন। অন্যরা গুরুর আসন না পেলেও গুরুস্থানীয় গণ্য হবেন এবং ভক্তিরসে সিক্ত হবেন। অন্যদিকে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বজায় রাখবেন দাস্যভাব। ফলে সমাজের সব সদস্যই বিশেষ মর্যাদা নিয়ে থাকবেন। এবং একই সঙ্গে সবাই সবার সাপেক্ষে দাস্যভাবে হাজির থাকবেন।

আমরা বুঝতে পারছি যে শিষ্য একজন শিক্ষার্থী হিসেবে গুরুর চরণদাসী হবেন এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে দাস্যভাব বজায় রাখবেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে গুরু নিজে অন্যের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত হবেন? এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাদের দেখা দরকার, লালন তাঁর গোটা কালামে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন। লালন নিজে একজন সাধক গুরু ছিলেন। তিনি অনুসারী ও ভক্তদের মাঝেই জীবনযাপন করেছেন। অথচ নিজেকে ব্যতিক্রমহীনভাবে উপস্থাপন করেছেন 'অবোধ', 'দীন-হীন', 'অধীন', 'অপার', 'পামর', 'মহাগোল পড়া', 'বেলিল্লা', 'চাটমারা', 'অন্ধ', 'ফেরে পড়া' হিসেবে। এখানে আমরা দেখি যে গুরুও সমাজের সদস্য হিসেবে দাস্যভাবই বজায় রাখবেন।

উপসংহার

গুরু স্বয়ম্ভু নন। গুরুর গুরুত্ব বোঝার জন্য দরকার শিষ্য। এমনকি গুরু যদি সমাজ পরিবর্তন করতে চান, তাহলেও তাঁর শিষ্য দরকার। এখন এই শিষ্যের সঙ্গে গুরু কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত হবেন? শিষ্য হবেন চরণদাসী। গুরু-শিষ্যের মধ্যকার যে দাসের সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক শুরু হয় শিষ্যের তরফ থেকে। শিষ্য প্রথমে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁর গুরু নির্বাচন করবেন। গুরুকে চিনে নেবেন। তারপর স্বেচ্ছায় গুরুতে সমর্পিত হবেন। ব্যাপারটা উল্টোভাবে ঘটবে না। গুরু কখনো শিষ্যকে নির্বাচন করবেন না; বরং শিষ্য গুরু নির্বাচন করবেন। গুরুতে সমর্পিত হতে হবে কেন? নিজের মধ্যকার মানুষকে নেহার বা দর্শন করার জন্য। দাস হবার সুবিধা অনেক। আত্মমুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থে ক্ষমতায়নের জন্য আত্মোন্নয়ন দরকার। আর সে জন্য দরকার প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি। কারণ, কোনো কাজে সার্থক হবার জন্য লক্ষ্যের প্রতি চাই অবিচল-অটল নিষ্ঠা। গুরুর অধীনে জেন্তে-মরে অর্থাৎ অহমকে নিয়ন্ত্রণে এনে শিষ্য যখন চিন্তা ও তৎপরতায় হাজির থাকে তখন তার মানবিক দিক পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়। আমরা তখন মানুষের রূপ দেখতে

পাই। অন্যথায় অহম এবং প্রবৃত্তির আবরণে মানুষের আসল রূপ ঢাকা পড়ে যায় এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বিকার দেখা দেয়। ফলে লালনের প্রকল্প হলো দাসায়নের মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষমতায়ন।

তথ্যসূত্র

১. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ৫৭৮।

২. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৪. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৫. Slavery Convention, 1926. Quoted in Kevin Bales, *Understanding Global Slavery*, Berkeley: University of California Press, 2005, pp. 43-44.

৬. Kevin Bales, *Understanding Global Slavery*, Berkeley: University of California Press, 2005, pp. 57.

৭. James Peggs, *Slavery in India: The Present State of East India Slavery*, London, 1938, pp. 43-44.

৮. James Peggs, *op. cit.*, 1938, p.44.

৯. James Peggs, *op. cit.*, p. 45.

১০. Sirajul Islam, Slavery, *Banglapedia*, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Slavery, accessed on 8 March 2018.

১১. Victoria Cuffel, The Classical Greek Concept of Slavery, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 27, No. 3, 1966, pp. 323-342.

১২. Hannah Arendt, *On Violence*, New York: A Harvest/HBJ Book, 1969, p. 50.

১৩. Friedrich Engels, Quoted in Wilfried Nippel, Marx, Weber and Classical Slavery, *Classical Ireland*, Vol. 12, 2005, p. 37.

১৪. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

১৬. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭।

১৭. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪।

১৮. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

১৯. Robert K Merton, Manifest and Latent Function. In Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff & Indermohan Virk eds. *Classical Sociological Theory*, Wiley Blackwell, 2007, p. 445.
২০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।
২১. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
২২. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।
২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।
২৪. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।
২৫. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।
২৬. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।
২৭. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
২৮. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
২৯. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৩০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭।
৩১. Katha Upanisad [1, 2, 8], Quoted in Joel D Mlecko, The Guru in Hindu Tradition, *Numen*, Vol. 29, Fasc. 1, 1982, p. 35.
৩২. Joel D Mlecko, The Guru in Hindu Tradition, *Numen*, Vol. 29, Fasc. 1, 1982, p. 35.
৩৩. Joel D Mlecko, *op. cit.*, p. 59.
৩৪. Arthur Avalon, *The Kularnavatantra*, Madras: Ganesh, 1965. Quoted in Andre Padoux, The Tantric Guru, in David Gordon White edited. *Tantra in Practice*, Princeton: Princeton University Press, 2000, pp. 41-51.
৩৫. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।
৩৬. সুধীর চক্রবর্তী, *বিচিত্র লোকায়ত*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ৫৫।
৩৭. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, সংগীত নং—৬৯৯, পৃ. ৩৯৩।
৩৮. টুনটুন ফকির, যে পেল সেই রূপের সন্ধান, উদ্ধৃত ফিরোজ এহতেশাম, সাধুকথা : *১৩ বাউল-ফকিরের সাথে কথাবার্তা*, ঢাকা : মেঘ, ২০১৮, পৃ. ১২৯।
৩৯. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৪০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
৪১. আবদেল মাননান, প্রাগুক্ত, সঙ্গীত নং—৬৯৯, পৃ. ৩৯৩।

নারীর অধস্তনতা মোচনে লালনীয় দাওয়াই

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সাহিত্যে প্রতিফলিত বঙ্গীয় নারীর বঞ্চনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে নারী-ক্ষমতায়নের পশ্চিমা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে দ্বিতীয় অংশে। তৃতীয় অংশে রয়েছে লালনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটি রূপরেখা। প্রবন্ধের শেষে প্রস্তাব করা হয়েছে যে মানব-সম্পর্ককে পরস্পর পরিপূরকভাবে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্কের লালনীয় রূপরেখা নারীর ক্ষমতায়নের পশ্চিমা তত্ত্ব থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময়।

ভূমিকা

মহাভারতের সাবিত্রী, রামায়ণের সীতা, মনসামঙ্গলকাব্যের বেহুলা কিংবা পল্লীবাসিনী নারী—এদের মধ্যে বিত্তবৈভবের পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে সবার মধ্যে দারুণ মিল। মিলটা হলো তাদের প্রাচুর্যে। এ প্রাচুর্য দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনার প্রাচুর্য। এদের কারও জীবন নিজের তরে নয়, একেবারেই পরের তরে। এবং তা ভয়ংকরভাবে পরনির্ভর। এ প্রসঙ্গে গবেষণার কমতি নেই। তাই গবেষণার উল্লেখ না করে একটি লোকপ্রিয় বাংলা গানের বরাত এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া
আমার ভাইধনরে কইও নাইওর নিতো বইলা
তোরা কে যাস কে যাস ॥
বছরখানি ঘুইরা গেল গেল রে ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, পাইলাম না
কইলজা আমার পুইড়া গেল গেল রে

ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, পাইলাম না...
ছিলাম রে কতই আশা লইয়া
ভাই না আইল গেল গেল রথের মেলা চইলা
তোরা কে যাস কে যাস
প্রাণ কান্দে, কান্দে প্রাণ কান্দে কান্দে প্রাণ কান্দে রে, প্রাণ কান্দে
নয়ন ঝরে ঝরে নয়ন ঝরে রে, নয়ন ঝরে
পোড়া মনরে বুঝাইলে বুঝে না
কান্দে কান্দে প্রাণ কান্দে
সুজন মাঝিরে ভাইরে কইয়ো গিয়া
না আসিলে স্বপনেতে দেখা দিত বইলা
তোরা কে যাস কে যাস...
সিন্দুরিয়া মেঘ ঘুরিয়া আইল রে ভাইয়ের খবর আনল না, আনল না
নির্দয় বিধি রে তুমিই সদয় হইয়া
ভাইরে আইনো নইলে আমার পরান যাবে জ্বইলা
তোরা কে যাস কে যাস।

(শিল্পী : শচীন দেববর্মন)

এই গানে স্পষ্ট যে পল্লিবালা তার শ্বশুরবাড়িতে হাঁপিয়ে উঠেছে। শ্বশুরালয়ে সে কতটা সুখী, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি রথের মেলায় যাবার জন্য তার আকুতি দেখে। স্নেহকাতর এ বধূ ভাইকে চোখের দেখা দেখতে চায় এবং আশা করে যে ভাই তাকে রথের মেলায় নিয়ে যাবে, যেখানে কিঞ্চিৎ বিনোদন সে পাবে। কিন্তু সেই ভাইও তার কোনো খোঁজ নেয় না। অবশেষে সবকিছুতেই বিফল হয়ে নির্দয় বিধিকেই সদয় হওয়ার জন্য আকুতি জানাচ্ছে এ বধূ। এটা স্পষ্ট যে পল্লিবধূর আকুতির মূল কারণ তার পরনির্ভরতা। পরনির্ভরতার জন্যই তার জীবন নিশ্চল। আর তার নিশ্চল জীবনে কিঞ্চিৎ সচলতা আনার জন্য তার কোনো সহায় নেই। নারীর পরনির্ভরতা নিয়ে গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমি কেন বা আসলাম গো ভবে
নারী জনম লইয়া
চিরদিন পরের অধীন পরের স্বাধীন গো
সদাই থাকি পরের মন জুগাইয়া
নারীর জনম লইয়া।।

শিশুকালে পিতার ঘরে আদরের ধন আদর করে
পিতা রেখেছেন পিঞ্জিরায় ভরে গো
কত দুধ-কলা-ভাত মাখাইয়া
নারীর জনম লইয়া।
যৌবনকালে আচম্বিতে সব সঁপিলাম স্বামীর হাতে
চিরদিন পরের হাতে পরের ভাতে গো
সদাই থাকি পরের মন জুগাইয়া
নারীর জনম লইয়া।।

(শিল্পী : সামিনা চৌধুরী)

গানটির উপজীব্য হলো নারী চিরদিনই পরাধীন, পরাশ্রয়ী ও পরনির্ভরশীল। সব সময় তাকে অন্যের মন জুগিয়ে চলতে হয়। নিজের মনের খবর নেওয়ার তার সুযোগ বা সময় কোনোটাই মেলে না। ফলে নারীর সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা একেবারেই অবিকশিত থাকে। এমনকি নারী যখন তার পিতৃগৃহে পরম যত্নে লালিত-পালিত হন, তখন অতিযত্নে লালিত-পালিত হন বটে, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ঘটে অধীনতার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। ফলে মানুষ হিসেবে নিজের সীমাকে নির্ধারণ করাটা আর তার হয়ে ওঠে না। তিনি বিত্তশালীই হোন আর বিত্তহীন, তাঁর পরনির্ভরতার কোনো হেরফের হয় না।

এ ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন* আমাদের সাহায্য করতে পারে। ১৮৭৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। রাসসুন্দরী দেবী পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র বারো বছর বয়সে ফরিদপুরের এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি মোট বারো সন্তানের মা ছিলেন। তাঁর বিবাহ-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই' (পৃ. ২২)। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'আমি তাহাদের পোষা পাখি হইয়া তাহাদের শরণাগত হইলাম'। তারপর তাঁর মাতৃত্বকালীন সময় কেমন কেটেছে সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

> ১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না। ঐ বাটীতে আটজন চাকরাণী ছিল, তাহারা বাহিরের লোক। সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একা মাত্র

ছিলাম ...সংসারের সমুদয় কাজ করিতাম।...ঐ সকল কাজের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্র ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দুবেলা আহার ঘটিত না; কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না।[১]

আবার, তাঁর পরনির্ভরতা সম্পর্কে লিখেছেন,

আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার খেদ করিয়াছিলেন। আহা! আমি এমন অধমা পাপীয়সী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি! আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দূরদৃষ্টহেতু কোনো ক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।...আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর-বদ্ধ পাখী (পৃ. ৩৮)।

এখানে, বঙ্গবাসী নারী-জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রথমত, তাদের পরনির্ভরতা; দ্বিতীয়ত, তাদের অধস্তনতা এবং অধস্তনতাহেতু মানসিক দৈন্য। সাধারণভাবে তাদের দুর্বলতর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গড়নকে তাদের অধস্তনতা ও পরনির্ভরতার জন্য দায়ী করা হয়। শক্তিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা একেবারেই আপেক্ষিক বিষয়। বহু ক্ষীণকায় পুরুষ শারীরিকভাবে অনেক নারীর চাইতে দুর্বলতর। বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেও একই কথা প্রযোজ্য। অচর্চিত পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর বহু-চর্চায়-বিকশিত নারীর বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে সকল বিচারে পিছিয়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে নারীর পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ তার দীর্ঘ মাতৃত্বকালীন নিশ্চলতা। এটি নারীর নারীত্ব প্রমাণের জন্য যতটা দরকার, তার চাইতে বেশি দরকার প্রজাতি হিসেবে মানবের অস্তিত্বের জন্য। মাতৃত্বকালীন নারীকে শুধু তার মাতৃত্বের প্রয়োজনেই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হয় (বা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অংশ নিতে হয়)। অনেক ক্ষেত্রে তাকে অন্যের ওপর নির্ভরও করতে হয়। ফলে পরপর মাতৃত্ব বরণ করার কারণে নারী তার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে এবং অন্য সকল কর্মপরিসর থেকে পিছিয়ে পড়ে (বা পেছাতে বাধ্য হয়)। নারীর সক্ষমতা বা উৎপাদনশীলতা বিষয়ের আলোচনাগুলোতে সাধারণত নারীর দীর্ঘ 'আপাত অনুৎপাদনশীল' সময়কেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই 'অনুৎপাদনশীলতা'কে চ্যালেঞ্জ বা মোকাবিলা নারী করতে পারে কি পারে

না, সেটা যতটা বিবেচ্য, তার চাইতে বড় বিবেচ্য হলো চ্যালেঞ্জ করার ফুরসত বা সময় কোথায়? আর সেই ফুরসত মেলে না বলেই নারীর অধস্তনতা চিরন্তন রূপ লাভ করে। কিন্তু শাস্ত্রের দাবি হলো নারীকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন যে নারীত্বের মূল্য কী, এ প্রশ্নটা যখন করা হয়, তখন আসলে জানতে চাওয়া হয়, 'কী পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাহাকে লইয়া কী পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে, এবং তিনি কী পরিমাণে রূপসী। অর্থাৎ, পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার আর কোনো পথ নাই... ।'[২]

অধস্তনতা থেকে উত্তরণ

দুর্দশা থেকে নারীর মুক্তি ঘটানোর আহ্বান কাজী নজরুল ইসলাম এভাবে জানিয়েছিলেন :

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা ॥

দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা ॥

ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি
জাগো মাতা-কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী
পতিতোদ্ধারিনী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সমবেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

নারীকে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে। কিন্তু জেগে ওঠার শক্তি তারা পাবে কোথায়? নারী কি অন্তর্গতভাবে অচেতনভাবেই মানসিক পঙ্গুত্বে ভুগছে না? বহু বছর যাবৎ সমাজ-সংসার সমস্ত নিয়মকানুন আর শিক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নারীকে এ কথাই তো শিখিয়েছে যে তুমি অস্পৃশ্য-অশুচি। তুমি দুর্বল শুধু

শক্তিতে নয়, বুদ্ধিতে, পর্যবেক্ষণেও দুর্বল। মানসিকভাবে, অন্তর্গতভাবে, দুর্বল করে রাখার জন্য যে বয়ানগুলো সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নারীকে শেখানো হয়, সেগুলো কোনো না কোনো শাস্ত্রের বরাত দিয়েই হয়ে থাকে। আর আঠারো-উনিশ ও বিশ শতক তো বটেই, একুশ শতকেও এ বয়ানগুলো নানাভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এমন ধর্মশাস্ত্র পাওয়া মুশকিল, যেখানে নারীকে পরনির্ভর, অপবিত্র বা অশুচি হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি। এমনকি যাঁরা নারীর অধিকারের জন্য সোচ্চার ছিলেন, তাঁরাও কখনো কখনো নারীকে অধস্তন হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। যেমন নারীর অধিকারের ব্যাপারে সাফাই দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লেখেন: 'নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, অনুভূতি ও ন্যায়-ধর্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন।'[৩] শাস্ত্রের অজুহাত তো রয়েছেই, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অন্য অনেক অজুহাত তৈরি করে নারীর অধস্তনতাকে জারি রাখা হয়।

অধস্তনতা থেকে মুক্তির পথ ক্ষমতায়ন

এখন পর্যন্ত আমাদের বিদ্যায়তনগুলোতে ক্ষমতায়নের যে সমস্ত উপায় পঠিত ও চর্চিত হয়, তার সবই আমরা পশ্চিম থেকেই রপ্ত করেছি। পশ্চিমা ক্ষমতায়ন-তত্ত্বের বিপরীতে পূর্বে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে এমন কোনো দাওয়াই বা ব্যবস্থাপত্র কি রয়েছে, যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব? অন্যভাবে বলতে গেলে, এদেশীয় মনীষীরা কি নারীর অধস্তন অবস্থা ও অবস্থানকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? যদি তাঁদের দৃষ্টিতে নারীর অধস্তনতা ধরা পড়ে থাকে, তাহলে তারা সে অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোনো কর্মপরিকল্পনার কথা কি ভাবতে পেরেছিলেন? এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে লালনকে আজ আমরা বেছে নিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে কথা পাড়ার আগে আসুন আমরা নারীর ক্ষমতায়নের পশ্চিমা-কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হই। নারীবাদী তাত্ত্বিক ও কর্মীরা বিশ্বাস করেন যে এযাবৎকাল পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস হলো পিতৃতন্ত্রের ইতিহাস (এ বিষয়ে জনপ্রিয় একটি কথা চালু আছে: His story is history and my story is mystry)। আর নারীবাদের ইতিহাস হলো পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। ভেরনিকা বিচের পর্যবেক্ষণ হলো: বিভিন্ন ঘরানার নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রকে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[৪] একেবারে সাদামাটা ভাষায়

বলতে গেলে, পিতৃতন্ত্র হলো পুরুষের আধিপত্য এবং ওই ধরনের ক্ষমতা সম্পর্ক, যার মাধ্যমে পুরুষ নারীর ওপর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, চড়াও হয়। কেট মিলেট বলেন, পিতৃতন্ত্র বলতে ওই সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কাঠামো, সংগঠন এবং এমনকি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝাবে, যা নারীর ওপরে পুরুষের আধিপত্য বা নারীর অধস্তনতাকে তৈরি করে এবং/অথবা শক্তিশালী করে।[৫] আবার জুলিয়েট মিশেল বলেন, পিতৃতন্ত্র হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং ক্ষমতার এমন চিহ্নায়ন, যেগুলো শেষ পর্যন্ত নারীর মধ্যে অপরের অধীন হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে।[৬] অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে জুলিয়েট মিশেল, মেকিনটস মেরিসহ অনেক নারীবাদী তাত্ত্বিক পিতৃতন্ত্রকে নারীবাদী আলোচনার কেন্দ্রে রাখার সমালোচনা করেন।[৭] তবে সিলভিয়া ওয়েলবি ও গোয়েন হানিকাট নারীর ক্ষমতাহীনতা, জেন্ডার ও ক্ষমতা সম্পর্ক ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গে রূপান্তরের জন্য ধারণা ও বাস্তবতা হিসেবে পিতৃতন্ত্রের আলোচনাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন। উল্লেখ্য, পিতৃতন্ত্র প্রকৃতিপ্রদত্ত নয়; কোনো ঘটনার মাধ্যমে এর উদ্ভব হয়নি; বরং দীর্ঘ সময় ধরে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর জন্ম ও বিকাশ। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৫০০ বছরে পিতৃতন্ত্র জন্মলাভ করেছে।[৮] পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, সিলভিয়া ওয়েলবি বলেন, ইতিহাসের সব সময়ে এই পিতৃতন্ত্র একই রকম ছিল না। বরং স্থান ও কালভেদে পিতৃতন্ত্রের রূপ ও মাত্রায় তারতম্য ঘটে।[৯] আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিতৃতন্ত্র কোন রূপে হাজির ছিল, সে বিষয়ে সাহিত্য ও ইতিহাসে গবেষণা হয়েছে। আমরা শুধু এখানে এতটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে নারীর অধস্তনতা তখনো সমাজে অ্যাজেন্ডা হিসেবে হাজির হয়নি। বরং মানুষ হিসেবে নারী যে বেঁচে থাকার শিক্ষালাভের ন্যূনতম অধিকারটুকু ভোগ করার যোগ্য, সে বিষয়ে তৎকালীন সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা আর কিছুটা আন্দোলন তৈরি হচ্ছিল মাত্র। পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে নারীর মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো তার উত্তরোত্তর ক্ষমতায়ন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সব ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতায়ন দরকার বলে তাত্ত্বিকেরা মত দিয়েছেন।

এখন ক্ষমতায়ন বলতে আমরা কী বুঝব? যেহেতু পিতৃতন্ত্রই নারীর অধস্তনতার মূল কারণ, সে কারণে পিতৃতন্ত্রকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখে বা শক্তিশালী করে, সেগুলোর রূপান্তর ঘটাতে পারলেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব। নায়লা কবীর, গীতা সেন ও ক্যারেন গ্রাওন, শ্রীলতা

বাটলিওয়ালা প্রমুখ এই মতের অনুসারী।[১০] গীতা সেন বলেন, নারীর পছন্দ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে, তার স্বশাসন ও স্বকীয়তাকে খর্ব করে এবং তার সার্বিক কল্যাণকে ব্যাহত করে, এমন ক্ষমতাকাঠামো পাল্টে ফেলাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন। আসলে নারীর তার জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাই হলো ক্ষমতায়নের মূলকথা। আর এটাই নারীবাদীদের দীর্ঘদিনের দাবি।

পশ্চিমা ক্ষমতায়নের ধারণায় নারীর ক্ষমতায়নের দুটি দিক রয়েছে: প্রথমটি হলো বহিস্থ বা অন্যের সাপেক্ষে ক্ষমতা-অর্জন এবং দ্বিতীয়টি হলো: আত্মজ বা নিজের সক্ষমতাসংক্রান্ত।[১১] নারীর আত্মজ ক্ষমতায়নের দিকটি বেশ গুরুত্ববহ। নারী যদি ভেতর থেকে নিজেকে এবং নিজেদের ক্ষমতায়িত ভাবতে না পারে, তাহলে এটি অর্জিত হয় না। আবার বহিস্থ ক্ষমতায়ন একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত হওয়ার আগে নারী সমাজের পক্ষে অন্তর্গতভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া বেশ কঠিন। ফলে তাত্ত্বিকেরা নারীর বাহ্যিক ও আত্মজ দুই ধরনের ক্ষমতায়নের জন্য যুগপৎ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। নারী ক্ষমতায়ন কতটুকু হয়েছে, তা পরিমাপের জন্য যে কয়টি লক্ষণকে তাঁরা বিবেচনা করেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ আছে কি না বা কতটুকু আছে; পরিবারের আকার কেমন হবে, সে বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আদৌ আছে কি না বা থাকলে কতটুকু; নারীর চলাচলের স্বাধীনতা কতটুকু আছে; নারী তার পুরুষ সঙ্গী দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন কি না ইত্যাদি।[১২]

উল্লেখ্য, নারীবাদী তাত্ত্বিক ও কর্মীদের মধ্যে এমন ধারণাও রয়েছে যে ক্ষমতায়ন আবশ্যিকভাবেই অন্য কিছুর বা অন্য কারও সাপেক্ষে হতে হবে। আর নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনার সাধারণ লক্ষ্য হলো পুরুষ। ফলে পুরুষ (বা পুরুষের মতো) হয়ে ওঠা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য। যেহেতু নারী পুরুষের মতো ক্ষমতাবান হতে চায়, অনেক সময়ই মনে হয় [ক্ষেত্র বিশেষে ভ্রমও হয়] যে পুরুষ নারীর প্রতিপক্ষ। পশ্চিমা চোখে নারীর ক্ষমতায়নকে দেখার বিপদ অনেক। এই বিপদে প্রথম প্রজন্মের নারীবাদীরা পড়েননি [পড়তে পারতেন, কারণ তাদের ঝোঁক সেদিকেই ছিল]; কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের নারীবাদীরা ঠিকই পড়েছেন। যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (বেগম রোকেয়া) লিখেছেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।...আবশ্যক হইলে

আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমেজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ—সবই হইব।' এই কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এই উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ।'[১৩] অর্থাৎ তাদের চিন্তার দুনিয়া পুরুষাচ্ছন্নই ছিল। এ ধরনের চিন্তার বিপদটা টের পাওয়া যায় তখন, যখন এর পরের প্রজন্মের নারীরা আরেকটু অগ্রসর হয়ে ভাবতে, লিখতে এবং প্রচার করতে শুরু করেন যে কোনো কোনো পুরুষ যেহেতু বহু নারী গমন করেন, সেই কারণে নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত (স্মরণ করুন, তসলিমা নাসরিন)।[১৪] অবশ্য পশ্চিমা নারী ক্ষমতায়নের এ সীমাবদ্ধতাটুকু সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আজকে নারীর যতখানি ক্ষমতায়ন হয়েছে, তার জন্য এ চিন্তার ইতিবাচকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে।

লালনীয় ব্যবস্থাপত্র

আগেই বলেছি, লালনের জীবনের পরিধি ছিল আঠারো ও উনিশ শতকজুড়ে। বঙ্গীয় নারীকুলের যে গঞ্জনা-বঞ্চনা ও দুঃখগাথা সমাজের পরতে পরতে ছিল, তারই প্রেক্ষাপটে লালন নারী-পুরুষ সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব হাজির করেছেন। পুরুষালি দাপট আর নারীর অক্ষমতার যে বয়ান সমাজে প্রচলিত ছিল, তার বিপরীতে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সহজ ছন্দে ছন্দায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে লালন তাঁর পূর্বতন দেশি-বিদেশি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হননি। লালন নিজেও সেটা স্বীকার করেন কৃতজ্ঞতাভরে, 'তিন-পাগলে হলো মেলা নদে এসে .... অদ্বৈ, নিতে, চৈতে পাগল নাম ধরে সে'। অর্থাৎ তাঁর কালে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন চিন্তার যে সমন্বয় ঘটেছিল, লালন তাকেই সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ বয়ান পুরোপুরিভাবে লালনের—এমন দাবি আমরা করি না, তবে এটা নিশ্চয়ই দাবি করি যে এ বয়ান বঙ্গভূমি থেকে উদ্ভূত। সে অর্থে এই বয়ান দেশজ। সবচেয়ে বড় কথা, নারী ক্ষমতায়নের পশ্চিমা বয়ানের চেয়ে মানবচেতনা, মানব-সম্পর্ক ও সর্বোপরি মানবসমাজকে রূপান্তরের জন্য এটি অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। আসুন, আমরা লালনের বয়ানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে পরিচিত হই।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের প্রথম ধাপ সাধনা

নারী-পুরুষনির্বিশেষে লালনের ব্যবস্থাপত্র হলো সাধনার ব্যবস্থাপত্র। পশ্চিমা ক্ষমতায়ন-তত্ত্ব অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের অন্যতম নির্দেশক হলো নারী তার পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতিত বা প্রহৃত হচ্ছেন কি না। অর্থাৎ নারীর শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সে জন্য দেশে-বিদেশে নারী সুরক্ষার জন্য কঠিন থেকে সুকঠিন আইন হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়; এখানে নারী ও শিশু নির্যাতন জামিন-অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু লালনের নারী আর যা-ই হোক 'রমণী' বা 'স্ত্রী' নন। নারী হলেন 'সাধনসঙ্গী'। ফলে 'নারীত্বের' বা 'রমণীত্বের' যে অধস্তনতা, লালন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নারীকে পুরুষের সাধনার পথে তাকে একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে হাজির করেছেন।

নারীর ব্যাপারে লালনের বিকল্প বয়ান

লালন নারীকে অস্পৃশ্যতা, অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করেছেন। নারীর অশুচিতা যেভাবে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলোতে চিত্রিত হয়েছে, লালন তাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছেন। কতিপয় শাস্ত্রে নারীকে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আবার কিছু শাস্ত্রে রজবতী নারীকে বলা হয়েছে অশুচি। নারীর আপাত দুর্বলতাজনিত কারণে যারা তাদের অধস্তনতাকে ন্যায্য মনে করেন, লালন তাদের মনে করিয়ে দেন যে গোটা দুনিয়ার রক্ষণ প্রকৃতিগতভাবেই নারীর ওপর, 'যার উপর দুনিয়ার ভার দিলেন রাব্বানা/ মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা'। অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের ধারক হলেন নারী। যিনি গোটা সৃষ্টিকে ধারণ করেন, তিনি অক্ষম হবেন কেন? আর তিনি যদি অক্ষম-দুর্বল হন, তাহলে সবল ও সক্ষম কে? লালন এ প্রসঙ্গে সকলকে সৃষ্টিতত্ত্ব মনে করিয়ে দেন: পুরুষ পরোয়ার দিগার/ অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার/ প্রকৃতি, প্রকৃতি সংসার/ সব গেল জানা। তার মানে জগতের স্রষ্টা পরম পুরুষ। তিনি পুরুষ এই কারণে যে তিনি ইচ্ছা করেছেন বলেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। কিন্তু হয় কীভাবে? কী উপায়ে হয়? সৃষ্টির শর্ত বা 'উপায়' বা 'হওয়ার অবস্থা' তাঁর সঙ্গেই বিরাজ করে। সে জন্য তিনি নিজেই প্রকৃতি। আর তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের মৈথুনে জগৎসংসার তৈরি হয়। ফলে প্রকৃতি পরোয়ারদিগারেরই রূপ মাত্র। আর

নারী প্রকৃতি হিসেবে সবকিছুকে ধারণ করেন। যিনি নিজেকে পুরুষ দাবি করবেন, তাঁর 'ইচ্ছা' তাৎপর্যপূর্ণ। সৃষ্টির জন্য তিনি তারই 'অপর'-এর সঙ্গে মিলিত হবেন। ফলে প্রকৃতির মধ্যে যেমন শুচিতা-অশুচিতার ভেদ নেই, নারীর মধ্যেও কোনো অশুচিতা নেই। তাঁর রজঃকালীন বিশেষ সময়ে তো নয়ই। রজঃকালীন সময়টি বরং সৃষ্টিশীল সম্ভাবনারই ইঙ্গিত।

এক ফুলের মর্ম জানতে হয়
যে ফুলে অটল বিহারে বলতে লাগে ভয়।
ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে তার অমৃতসুধা
এমন ফুল দুনিয়ায় পয়দা
জানিলে দুর্গতি যায়।।
চিরদিন সেই যে ফুল
দীন দুনিয়াতে মকবুল
যাতে পয়দা দীনের রাসুল
সে ফুল তো সামান্য নয়।
জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরু পূজা
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় এ ভেদ বুঝা
লালন ভেঁড়ের কার্য নয়।

লালনের উপদেশ হলো আত্মতত্ত্ব জানতে হবে। আত্মতত্ত্ব কী? 'আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে, আমার কী কাজ, আমার পরিণাম কী?'—এসব প্রশ্নের জবাব অনুধাবন করার নামই হলো আত্মতত্ত্ব। লালন আমাদের আত্মতত্ত্ব শেখান: সৃষ্টির জন্য 'অটল' ঈশ্বর যেখানে বিরাজ করেন, সেই ফুলকে জানার সাহস আমাদের করতে হবে। সেই ফুল যিনি ধারণ করেন তিনি জগতের প্রফুল্লতার কারণ; তাঁর মাঝে অমৃতসুধা; আর তাঁর দ্বারাই দুনিয়ার সৃষ্টি। জগতের যত মহাজন, মুর্শিদ-রসুল সকলেই সেই ফুল (জরায়ু) থেকেই জন্ম নেন। আর গুরু হিসেবে কাউকে যদি ভক্তি প্রদর্শন করতে হয়, তাহলে সেই ফুলের ধারককে অর্থাৎ নারীকেই প্রথমে করতে হবে। আমরা দেখি লালন নারীকে করেছেন সাধনসঙ্গী, নারীকে বসিয়েছেন সাধকের 'গুরু'র মর্যাদায়।

শাস্ত্রানুযায়ী, রজঃকালে নারীকে অশুচিজ্ঞান করা হয়। ব্যাপারটাকে অন্যদিক থেকেও দেখা যায়: রজঃবিবর্জিত নারী কি আকাঙ্ক্ষিত? কখনো

নয়। নারীকে অশুচি বলা 'সোনার পাথরবাটি'র মতোই সাংঘর্ষিক। কেননা, শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে রজঃকালীন নারী অশুচি, অথচ রজোত্তীর্ণ নারীও তাদের কাম্য নয়। লালনের মতে, রজঃকালীন নারী সবচেয়ে বেশি তেজোদীপ্ত ও উদ্যমী। তাই সাধক এ সময়ই তাঁর সাধনসঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গ করবেন। এদিক থেকে লালন, নারীর ব্যাপারে শাস্ত্রের বিধানকে শুধু খারিজই করেননি, পুরোপুরি উল্টে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এ সময়টিই তাঁর নারী 'সাধনসঙ্গী'র সঙ্গে 'সঙ্গ' করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। 'মনের মানুষ' ধরার জন্য এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।[১৫] এ প্রসঙ্গে লালনের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' গানটির কিছু অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ছয় মাসের এক কন্যা ছিল/ নয় মাসে তার গর্ভ হলো/ আবার এগারো মাসে তিনটি সন্তান/ বলো কে করিবে ফকিরি'।...ঘর আছে তার দুয়ার নাই/ লোক আছে তার বাক্য নাই নাই রে/ আবার কে তাহারে আহার জোগায়/ কে দেয় সন্ধ্যা-বাতি। ফকির লালন ভেবে বলে ছেলে মরে মাকে ছুলে গো।...এ তিন কথার অর্থ না জানলে তার হবে না ফকিরি'। নারী দেহে অবস্থিত ডিম্বাণুর বয়স যখন ছয় দিন হয় তখন তা নিষিক্ত হবার উপযুক্ত হয়। তারপর নয় দিন পর্যন্ত এটি একটি শুক্রাণুর জন্য অপেক্ষা করে। এ সময় সে কোনো একটি শুক্রাণুর সংস্পর্শে এলে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয়। অন্যথায়, এগারো দিনের মাথায় সে তার নিজস্ব শক্তিতে প্রবল বেগে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তিনটি ধারা তৈরি হয় : ইলা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। তারাই তিনটি সন্তান। এর মধ্যে সাধক জানেন কাকে ধরতে হবে। সাধক সাধনা করবেন এই সময়। এটি তার স্বাভাবিক সাধনার সময়। এর বাইরে তিনি সাধনসঙ্গীর সঙ্গ করবেন শুধু সৃষ্টির জন্য। নতুন প্রাণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধক যখন সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গ করেন, তখন ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। মায়ের পেটে শিশুটি বড় হতে থাকে। তার অবস্থা এমন যে তার বের হওয়ার জন্য কোনো পথ থাকে না, তার আহারেরও কোনো উপায় থাকে না, কিন্তু সে মায়ের শরীর থেকেই পুষ্টি আহরণ করে। একপর্যায়ে সে মায়ের শরীর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। সাধনা ও সৃষ্টি এই দুই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে, যেমন কামতাড়িত হয়ে, কেউ যখন নারীসঙ্গ করেন, বীর্যক্ষয় করেন, তখন সে আর মানুষ থাকে না, তার মানুষ-রূপের মরণ ঘটে (ছেলে মরে মাকে ছু'লে গো); সে তখন অন্য রূপে আবির্ভূত হয়। কামী তার কাম চরিতার্থ করার জন্য যেখানে উপগত হচ্ছে, সেটি তো নারী জননাঙ্গ। সেটি একই সঙ্গে তার জন্মক্ষেত্রও বটে।

সেদিক থেকে দেখলে কামাতুর ব্যক্তি তার মা রূপ নারীর দ্বারা লালসা চরিতার্থ করে। এ ব্যাপারে লালন বলেন :

ঝাঁপ দিলি তোর বাবার পুকুরে
ওরে কামে চিত্ত পাগলপারা
ডুবলে কূল না পেয়ে।
কেন রে মন এমন হলি
যাতে জন্ম তাতেই ম'লি
ঘুরতে হবে লক্ষ গলি
হাতে পায়ে বেড়ি সার করে॥

লালন জানেন, নারী শরীরের (জননাঙ্গের) প্রতি কামীর আকর্ষণ দুর্নিবার। তার এই লালসার কারণ হলো সে আসলে তার আত্মপরিচয় ভুলে যায়। সে ভুলে যায়, তার বাবা তাকে সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীর জননাঙ্গে গমন করেছিলেন। এবং সেই 'অঙ্গ'ই তার জন্মস্থান। সে জন্য লালন রূপকার্থে কামীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে যেখানে সে ডুব দিতে চায়, সেটা তার বাবার পুকুর। সেখানে (কামাতুর হয়ে) তার জন্য যাতায়াত একেবারে নিষিদ্ধই শুধু নয়; মানুষের স্বাভাবিক আচরণের বাইরে একধরনের পাশবিকতা। লালন বলছেন, জন্মমুহূর্তে কামী যে পর্যায়ের সচেতনতা নিয়ে জন্মেছে, এখনো সে একই পর্যায়ে রয়ে গেছে; মানবিকতায় উত্তরণ তার ঘটেনি। কামীর সেই জ্ঞান নেই যে মানুষ জননাঙ্গে জন্মলাভ করে বটে, কিন্তু পরিণত বয়সে তার মনোযোগ যদি জননাঙ্গেই থাকে, তাহলে তা তো আর মানুষের জীবন হয় না। লালন তাই সকলকে সতর্ক করছেন : বাবার পুকুরে কামান্ধ হয়ে ঝাঁপ না দিতে। যদি তাই হয়, তাহলে সাধক সাধনসঙ্গীর সঙ্গ কেন করবে? করবে দুটি কারণে : প্রথমত : সাধনার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির জন্য। কখনো কাম-চরিতার্থ করার জন্য নয়। সে জন্যই লালনপন্থীরা সকল নারীকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। সাধনসঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গ করার সময়ও নির্দিষ্ট। সে সময় সাধকের আবশ্যিকভাবে বস্তু (বীর্য) রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। আর সে সময়টা এমনভাবে নির্ধারণ করা যে তখন সাধক বস্তু-রক্ষায় ব্যর্থ হলেও তার সাধনসঙ্গীর গর্ভধারণ হবে না (কেননা তখনো ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার জন্য পরিণত রূপ লাভ করেনি)। তাহলে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে, লালনের যে সাধনা, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা যা-ই থাকুক না কেন, এর সাক্ষাৎ ফল হলো 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। আর সাধক যখন সাধনার মাধ্যমে শুধু পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'সৃষ্টির ইচ্ছা' করেন এবং বীর্যপাত ঘটান, তখনই তিনি পুরুষ হয়ে ওঠেন।

এটা যদি তাঁর সচেতন ইচ্ছার প্রকাশ না হয়ে নেহাত 'কামাতুর অবস্থার পরিণতি' হয়ে থাকে, তাহলে তার সাধনা মাটি।

তুলনামূলক আলোচনা

লালনের দেহকেন্দ্রিক সাধনার মরমি বা আধ্যাত্মিক পরিনাম যা-ই হোক না কেন, এর সাক্ষাৎ ফল হলো ইচ্ছামাফিক গর্ভধারণ। সুধীর চক্রবর্তীর মতো কেরোলা লরিয়া এবং জুন ম্যাকড্যানিয়েল মনে করেন, লালনপন্থীদের যৌনাচারকেন্দ্রিক সাধনা আসলে এক ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া।[১৬] লিসা নাইটও বাউলদের মনোভঙ্গি সম্পর্কে একই রকম বর্ণনা আমাদের সামনে হাজির করেন। তাঁর মতে, বাউলেরা সন্তানকে তাঁদের নিজেদের পূর্ণতা অর্জনের পথে বাধা হিসেবে মনে করেন।[১৭] বাউল সম্প্রদায় একই সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সুপ্রজননের জয়গান করেন। সন্তান ধারণ এবং জন্মদানের যে যন্ত্রণা, এর সঙ্গে তাঁরা 'সহজ' স্বাভাবিক অবস্থার তুলনা করে থাকেন; সন্তানের যদি পরিকল্পনামাফিক জন্মদান করা যায়, তাহলে তাঁদের মতে, সাধনায় অধিকতর মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয়। নাইট আরও উল্লেখ করেন, বাউলেরা যে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে বসবাস করে, সেখানে অনেকেই তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যও অনেক গৃহী বাউলদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের সাধনার সবচেয়ে বড় বিষয়, যা নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং পণ্ডিতনির্বিশেষে একধরনের ভুল-বোঝাবুঝি আছে, হলো প্রেম (ইংরেজিতে লাভ), কাম (ইংরেজিতে লাস্ট) নয়। নারী যেমন নিজের মাঝে ভ্রূণ তৈরি করেন এবং এই সৃষ্টির মাঝেই তার নারীত্বের মর্ম নিহিত থাকে, পুরুষের জন্যও একই সাধনা : পুরুষ সাধক তার নিজের দেহে এক স্বর্ণালি ভ্রূণ তৈরি করবেন; বলা বাহুল্য, এর ফলে কোনো সন্তান সৃষ্টি হবে না।[১৮] নারীবাদী আন্দোলন বিশ ও একুশ শতকে যে বেগবান হয়েছে এবং নারীরা যে পৃথিবীব্যাপী পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতায়িত হচ্ছে, তার অন্যতম কারণ হলো নারীর মাতৃত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। আঠারো ও উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলায় আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি যেখানে একেবারেই অপরিচিত ছিল, লালনের 'সাধন-পদ্ধতি' সেখানে নিশ্চিতভাবেই 'পরিকল্পিত পরিবার'-এর রূপরেখা হাজির করে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ নারী হয়ে উঠতে পারে অনেক বেশি উৎপাদনশীল, অনেক বেশি

গতিময় এবং নিজের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী। এ পর্যায়ে বারো সন্তানের জননী রাসসুন্দরী দেবীর কথা মনে করা যেতে পারে। বিত্তের অভাব না থাকলেও শুধু সময়ের অভাবে তিনি খাওয়ার সময়টুকুও বের করতে পারেননি। সে জন্য 'বাউলদের কাছ থেকে এই গৃহী শিষ্যরা যে বিন্দুধারণ শেখে, সেটাই সন্তান-জন্ম রোধের শিক্ষা'।[১৯] একজন বাউলানি অকপটে স্বীকার করেন, 'আমি যারই এক ছেলে হয়ে গেছে, তাকেই শিক্ষা দিয়েছি। আর বাচ্চা হয় না'।[২০] লীনা চাকী বাউলানিদের সম্পর্কে লেখেন, 'এই জীবনে তাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি 'বিধবা' পরিচয় না পাওয়া। একটা ধর্মপথে তাদের কোনো প্রাপ্তি থাকুক বা না থাকুক, ভয়ংকর বিধবা শব্দের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছে বাউলসঙ্গে এসে'।[২১]

জুন ম্যাকড্যানিয়েলের মত হলো, লালনের অনুসারীরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানে নারীকে পুরুষের সমান গণ্য করেন; অনুৎপাদনশীল যৌনক্রিয়াকে ক্ষেত্রবিশেষে সন্তান জন্মদানের লক্ষ্যে লিপ্ত যৌনক্রিয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন; তাঁরা রজঃকালীন সময়কে একই সঙ্গে ইতিবাচক এবং আধ্যাত্মিক বলে গণ্য করেন এবং সবশেষে নারীদেহকে দেবতার আসন হিসেবে পবিত্র বলে গণ্য করেন। এই বিষয়গুলো দারুণভাবে বৈপ্লবিক। কেননা ইতিহাসে এমনটা দুর্লভ।[২২] বাংলার বাউলানিদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে লীনা চাকী দেখান যে বিধবা, সধবা ও বালিকা—সব ধরনের নারীই সাধু-সঙ্গ করতে আসেন। ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁরা সবাই দরিদ্র ও শিক্ষাহীন (বা অল্প শিক্ষিত) পরিবার থেকে আসা। এদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো: 'আমার চারধারের বাউলানিরা বাউলদের নামে অভিযোগ করে বা বেদনা প্রকাশ করে, কিন্তু কেউ ভুলেও বলে না, "এবার ফিরতে চাই" বা "ফিরে পেতে চাই আগের জীবন"। কখনো এই বিরুদ্ধ ভাবনা তাদের মনের কোণে ঠাঁই পায় না।'[২৩]

তবে তাঁদের সাধনার বিষয়ে নেতিবাচকতা কম নেই। ম্যাকড্যানিয়েল বলেন, সাধুরা যেসব ভৈরবী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁরা আসলে সেবাদাসী। তাঁরা নেহাত পরিচারিকা বা আচার-অনুষ্ঠানের সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। এদের সঙ্গে সাধুদের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করার কোনো লক্ষ্য থাকে না। বরং সাধুদের লক্ষ্য থাকে এ জগতের বাসনা থেকে চিরমুক্তির; আর বাসনার একটি অংশ হলো নর-নারীর মধ্যকার সম্পর্ক। সাধুর কাছে ভালো-মন্দের, লজ্জা-ভয়ের কিংবা ধর্ম-অধর্মের ফারাক নেই।[২৪] অনেকে অভিযোগ করেন যে লালনপন্থীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভাব

রয়েছে। তাঁরা নোংরা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁরা মল, মূত্র, রজঃ ও বীর্য—এই চার চন্দ্রের সাধনা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের কেউ কেউ বিশেষ প্রক্রিয়ায় এগুলো সেবনও করেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাউলেরা এই চার চন্দ্রের সাধনা করেন। কিন্তু তাদের এই সাধন পদ্ধতির ব্যাপারে দুটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার। প্রথমত, তাঁরা মনে করেন যে যা আছে ভান্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। ভান্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ফারাক যেহেতু তাঁরা করেন না, তাঁদের বর্জ্যসংক্রান্ত ধারণাও সমাজে প্রচলিত ধারণা থেকে আলাদা। তাঁরা মনে করেন সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যদি তাঁদের সাধন পদ্ধতিকে 'অহম' (কিংবা প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন যে 'আধুনিক' ও 'সভ্য' অহমিকা রয়েছে—সেটা) থেকে মুক্ত হওয়ার ও দাস্যভাবে হাজির থাকার কৌশল হিসেবে চর্চা করে থাকেন, তাহলে সেটা কি দোষণীয়? প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন 'সভ্য' মানুষ প্রতিদিন যে পরিমাণ আণবিক বর্জ্য উৎপাদন করছেন, তার তুলনায় মানব রজঃ-বীর্য-মল-মূত্র কতটুকু বর্জনীয়?

লালনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের কয়েকটি দিক আমাদের নজরে আসে। প্রথমত, লালন পুরুষকে শুধু নারীর গুণবিশিষ্ট প্রকৃতি হিসেবে জীবনকে যাপন করার পরামর্শই দেন না, নারীকে হাজির করেন পুরুষের সাধনার বিষয়বস্তু হিসেবে (আবার কখনো গুরু হিসেবে)। নারীকে করেছেন পুরুষের সাধনসঙ্গী (বলা বাহুল্য, লালনের মতে, মানুষের জীবনের একমাত্র ব্রত হলো সাধনা)। দ্বিতীয়ত, নর-নারীর সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো তাদের মধ্যকার যৌনতা। সুধীর চক্রবর্তী, আনোয়ারুল করিম, জুন ম্যাকড্যানিয়েলসহ প্রায় সব গবেষকই মত প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের যৌনতার আধ্যাত্মিক দিক যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তব ফল হলো 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। সাধু তাঁর 'বস্তু রক্ষা'র নামে যা করেন, তা হলো 'বীর্যপাত নিয়ন্ত্রণ'। আর এর নিয়ন্ত্রণ না হলেও যে সময়ে 'মীন সাধনা' করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেই সময়ে নারীদেহে এমন অবস্থা বিরাজ করে যে সেই সময়ে 'গর্ভধারণ'-এর সম্ভাবনা থাকেই না। সে কারণে নারী তার শ্রমের ও সময়ের ব্যবহার কীভাবে করবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমনকি কখন নতুন প্রাণ সৃষ্টি করে 'মাতৃত্ব' অর্জন করতে চায়, সে সিদ্ধান্তও সচেতনভাবে নিজেই নেয়। এর ফলে নারীর নিজের শরীরের ওপর, সময় ও শ্রমের ওপর এবং সর্বোপরি নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তৃতীয়ত, সমাজে চলমান যে বয়ানগুলো (শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয়) নারীদের মানসিকভাবে পুরুষের অধস্তন করে রাখে, লালন সেগুলোকে পুরোপুরি উল্টে দিয়েছেন। শাস্ত্র নারীদের অপবিত্র ও দুর্বল

হিসেবে দেখে এবং দেখতে বলে। এর বিপরীতে লালন নারীকে সব অপবিত্রতা থেকে মুক্তি দেন। তিনি প্রচার করেন যে জগতে নারীই সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত ও সৃষ্টিশীল।

সমাজের পরতে পরতে থাকা পিতৃতন্ত্রকে ক্রমাগত দুর্বল করে একসময় একে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করা হলো পশ্চিমা ক্ষমতায়ন কাঠামোর লক্ষ্য। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ক্ষমতায়নের এই ব্যবস্থাপত্র একেবারেই পুরুষাচ্ছন্ন। অর্থাৎ, এটি পুরুষকে অনুকরণ করতে চায়। পুরুষ যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে নারীকেও পারতে হবে, পুরুষ যদি একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয়, তাহলে নারীকেও সে কাজে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে—এ ধরনের মনোভাব পশ্চিমা ধাঁচের নারীবাদীদের মধ্যে প্রবল। পশ্চিমা নারী ক্ষমতায়ন তত্ত্বে নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার সুযোগ থাকে। এর বিপরীতে লালন নারী-পুরুষ সম্পর্ককে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থানে নয়, বরং সহযোগিতামূলক ভক্তির সম্পর্কে রূপান্তর করার প্রস্তাব দেন। পুরুষ নারীকে গুরু রূপে ভজনা করবে, নারীকে সাধনসঙ্গী হিসেবে আত্মোন্নয়নের জন্য কাজে লাগাবে এবং সবশেষে সৃষ্টির ধারক হিসেবে প্রকৃতিরূপে যত্ন নেবে। অন্যদিকে নারী পুরুষের পরিপূরক হিসেবে, জন্মদাত্রী হিসেবে, একজন পবিত্র এবং স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নিজেকে বিকশিত করবে। আজকের দিনে নারী যে হারে পুরুষের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, সেটা আতঙ্কজনক। চার বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের নারীরা পর্যন্ত কামার্ত পশুর পাশবিকতার শিকার। আজকের দিনের পুরুষের জন্য লালন সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কেননা, লালনের পুরুষ নিজে নারী রূপে, প্রকৃতি রূপে হাজির থাকার সাধনা করেন; সত্যিকারের পুরুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন এবং সৃষ্টি করেন, কামী হিসেবে কামকে চরিতার্থ করেন না এবং অযথা বীর্য ক্ষয় করেন না। আজকের পুরুষ লালনের সাধনার বলে বলীয়ান হলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক এক নতুন মাত্রায় পৌঁছাবে।

লালনের চিন্তাকাঠামোতে নারী জগতের সৃষ্টিশীলতার প্রতিমূর্তি। আর প্রতিটি পুরুষেরই সাধনা হলো নারী বা প্রকৃতি রূপে হাজির থাকার সাধনা। পুরুষের এই সাধনার সঙ্গী বা সাহায্যকারী হবেন নারী। সেদিক থেকে আমরা দেখি লালনের চিন্তাকাঠামো হলো 'নারীতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করার। পশ্চিমা ক্ষমতায়ন কাঠামো যেমন পুরুষাচ্ছন্ন, লালনীয় ক্ষমতায়ন কাঠামো হলো 'নারীতে আচ্ছন্ন'।

উপসংহার

বঙ্গীয় নারী যে শুধু আঠারো ও উনিশ শতকেই অধস্তন ছিল, তা নয়। তাদের অধস্তনতা আজও আছে। আছে তাদের নিপীড়ন ও নির্যাতন। নির্যাতন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে, যেখানে কন্যাশিশুরা হামেশাই পুরুষরূপী 'কামী-প্রাণী'দের বলাৎকারের শিকার হয়। নারীর ক্ষমতায়নের পশ্চিমা কাঠামো নিঃসন্দেহে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উত্তরণ অনেকখানি ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নারীরা আরও বেশি করে ক্ষমতায়িত হবেন। কিন্তু এ ক্ষমতায়ন কি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক নয়? আর হয়তো যান্ত্রিক বলেই নারীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে নারীর নিপীড়নও। বাংলাদেশের প্রান্তীয় অঞ্চলের গরিব কন্যাশিশুটিই শুধু তার ঘরের কোণে অন্য 'পুরুষরূপী' কামীর লালসার শিকার হচ্ছে না, হলিউডের নামী তারকা 'নারীর'ও একই পরিণতি বরণ করে নিতে হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। এর অন্যতম কারণ, নারী সম্পর্কে পুরুষের মধ্যে তৈরি হওয়া 'ইমেজ' বা ভাবমূর্তি। সেই মূর্তি কেবল কামনার, লালসার ও ভোগের। সেই মূর্তি সাধনার, ভক্তির আর দাস্যভাবের নয়। কিন্তু লালন নারী ও পুরুষকে সাধনার, ভক্তির আর দাস্যভাবে পরস্পরকে দেখার এবং অনুভব করার প্রশিক্ষণ দেন, যার অনিবার্য ফল নারীর ক্ষমতায়ন। এ ক্ষমতায়ন যান্ত্রিক নয়, বরং মানুষের অন্তর্গত রূপান্তরের অনিবার্য পরিণতি। লালন পুরুষকে অন্তর্গতভাবে বদলে ফেলার এক প্রকল্প হাজির করেছেন, যার ফলে পুরুষ এবং নারী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরস্পরকে 'সৃষ্টিশীল'ভাবে আবিষ্কার করতে পারবে। সেদিক থেকে পশ্চিমা নারীবাদী চিন্তার পরিপূরক হিসেবে লালনের চিন্তাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। পশ্চিমা কাঠামো যেখানে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে, লালনের প্রকল্প সেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্কের রূপান্তর ঘটাবে অন্তর্গত বিপ্লবের মাধ্যমে। ফলে নারী হবে পুরুষের সাধনার সঙ্গী। পুরুষ হবেন নারীর ভক্ত ও দাস। ভক্তরূপে, দাসরূপে হাজির থেকে পুরুষ প্রকৃতির মাঝে 'সহজ মানুষ' হিসেবে হাজির থাকবেন। তার কামী সত্তার লোপ ঘটবে। আর তা হতে পারে একমাত্র সাধনায়।

তথ্যসূত্র

১. রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, কলিকাতা : ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটস, ১৮৭৬, পৃ. ৩৪।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নারীর মূল্য*, কলকাতা : বাকসাহিত্য, ১৩৬৪, পৃ. ৬।

৩. শরৎচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৪. Veronica Beechey, On Patriarchy, *Feminist Review*, No. 3, 1979, pp. 66-82.

৫. Kate Millette, Sexual *Politics*, New York: Doubleday, 1969.

৬. Juliet Mitchell, *Psychoanalysis and Feminism*, London: Allen Lane, 1974, p. 402.

৭. দেখুন, Michelle Barrett and McIntosh Mary. The 'family wage': some problems for socialists and feminists. *Capital & Class Vol*. 4 No. 2, 1980, pp. 51-72; Sheila Rowbotham, *The trouble with. patriarchy in No Turning Back: writing from the women's liberation movement 1975-1980, ed.* Feminist Anthology Collective, London: Women's Press, 1981.

৮. Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*, New York: Oxford University Press, 1986.

৯. Szlvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.

১০. দেখুন, Naila Kabeer, Reflections on the Measurement of Women's Empowerment in *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, Sida Studies No. 3, (Novum Grafiska AB: Stockholm), 2001; Gita Sen and Caren Grown, Development, Crises, and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives (New York: *Monthly Review Press*), 1987; Srilatha Batliwala, The Meaning of Women's Empowerment: New Concepts in Action in Gita Sen, A Germain and L C Chen (ed.) *Population Policies Reconsidered: health, Empowerment and Rights* (Cambridge: Harvard University Press), 1994, pp. 127-38.

১১. Ed Diener & Robert Biswas-Diener, Psychological Empowerment and Subjective Well-Being. In Deepa Narayan eds. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*, Washington: The World Bank, 2005.

১২. Karen Oppenheim Mason, Measuring Women's Empowerment: Learning from Cross-National Research. In Deepa Narayan eds. *Measuring Empowerment: Cross-National Perspective*, Washington: The World Bank, 2005.

১৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, সম্পাদনা আবদুল কাদির, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬, পৃ. ২১।

১৪. তসলিমা নাসরিন, *নারীর কোন দেশ নেই*, কলকাতা : ঋজু, ২০০৭, পৃ. ১৫।

১৫. উদাহরণ হিসেবে সুধীর বলেন, 'মনের মানুষ' তত্ত্ব কোনো মানবতাবাদের প্রতীক নয়—নিতান্তই যৌন—যৌগিক পরিভাষা। সেই 'মনের মানুষ'কেই তাঁরা সকলের কাছে আবৃত রাখতে চেয়েছিলেন।' (সুধীর চক্রবর্তী, *বাউল ফকির কথা*, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১৪৭)।

১৬. Carola Lorea, 'Why did you go swimming in the river full of algae? - Conception and contraception in Bauls songs and oral teachings', *Folklore and Folkloristics*, Vol. 7, No. 1, 2014, pp. 9-45; June McDaniel, The Embodiment of God among the Bauls of Bengal, *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol. 8, No. 2, 1992, p. 34.

১৭. Lisa I. Knight, Bauls in Conversation: Cultivating Oppositional Ideology, *International Journal of Hindu Studies*, Vol. 14, No. 1, 2010, pp. 71-120.

১৮. শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল : উদ্ভব, সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শন*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৩৪১।

১৯. লীনা চাকী, *বাংলার বাউলানি*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ১৭।

২০. লীনা চাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২১. লীনা চাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২২. June McDaniel, op. *cit., p*. 27.

২৩. লীনা চাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

২৪. June McDaniel, op. *cit., p*. 37.

উপসংহার

লালনের কালামে বস্তুগত সম্পদ বণ্টনাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতার প্রত্যক্ষ কোনো ইঙ্গিত নেই। নেই অন্যকে ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের কোনো রূপরেখা। প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোনো প্রত্যক্ষ তাগিদও নেই। কৌশলে অন্যের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক বা অন্য কোনো ধরনের আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনো ভণিতাও নেই। নেই অপরাপর পদ্ধতি, চর্চা ও মনোভাবকে খারিজ করে দেওয়ার ভণ্ডামিও। লালনের গোড়ার কথা হলো, সমাজ ও সভ্যতা মানুষের সামষ্টিক চৈতন্য, ইচ্ছা ও কর্মের ফল। কিন্তু সেই ইচ্ছা ও কর্ম (অতীতে যেমনটা ছিল, ঠিক তেমনি) আজও কতিপয় প্রত্যয়-বিশ্বাস ও কল্পমূর্তির রাজ্যে চর্চিত (বা অনুশীলিত) হয়। আর সেই প্রত্যয় ও কল্পমূর্তি-আশ্রিত চিন্তাই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মকে অর্থবহ করে তোলে ও স্থিতি প্রদান করে। লালন ঐতিহাসিকভাবে তৈরি হওয়া চিন্তার সেই গতানুগতিকতাকে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতি হলো খোদ রাজনীতি বিষয়ে আমাদের চিন্তার আমূল পরিবর্তনের রাজনীতি।

আমরা জানি, লালনের সমাজ ছিল ঔপনিবেশিক ও শোষণমূলক। আর সেই শোষণের অনুষঙ্গ ছিল কতিপয় আচারনিষ্ঠ ধর্ম (পর্যালোচনামূলক ধর্ম নয়)। কিন্তু শোষণমূলক ক্ষমতাকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ তাঁর কালামে নেই বললেই চলে। অধিপতি শ্রেণির আধিপত্যকে কালামের মাধ্যমে তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জও করেননি (কিন্তু বাস্তবে করেছেন : প্রথম অধ্যায় দেখুন)। স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে নাকচ না করে, সেগুলোকে না পাল্টিয়ে কিংবা সেগুলোর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত না হয়ে কি কোনো ধরনের রাজনীতি

সম্ভব? লালন কি সচেতনভাবেই সেসব প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন? এটা স্পষ্ট যে লালনের কালামে শোষণ-নিষ্পেষণের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সরাসরি মন্তব্য নেই। তবে লালন ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ না করে, সরাসরিভাবে নাকচ না করে এর সম্পর্কে অবিরাম পর্যালোচনা জারি রাখার তাগিদ দেন। আর এর মাধ্যমে তিনি যে ধারণাগুচ্ছকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করে প্রচলিত 'রাজনীতি' (কর্মকাণ্ড, প্রক্রিয়া ও চিন্তা—সকল অর্থেই) চলমান থাকে, সেই ধারণাগুচ্ছকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। এর ফলে রাজনীতির নামে যে মেকি-রাজনীতির চর্চা প্রচলিত, সে বয়ানটি সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে (যেমন লালনের কালামের ফলে জাতি, ধর্ম, গোত্র ইত্যাদি পরিচয়াশ্রয়ী রাজনীতির অসারতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়)। একই সঙ্গে লালন নিজের অবস্থানের অনিশ্চয়তাকেও অকপটে প্রকাশের তাগিদ দেন। সবাইকে জানাতে চান যে কোনো সত্যই চূড়ান্ত নয়। বরং যা কিছু 'সত্য' বা 'স্বাভাবিক', অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তাকেও 'অলীক' বলে মনে হতে পারে। সম্ভবত সে জন্যই ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য লালন কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব করেননি।

লালনের চিন্তার ফল হলো সত্যিকারের রাজনীতি। নতুন রাজনীতি। এই রাজনীতি ক্ষমতাবান লোকেরা যাকে রাজনীতি বলে সাব্যস্ত করে, সংজ্ঞায়ন করে, সেই রাজনীতি নয়। লালনের রাজনীতি হলো রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞাকে বদলে দেওয়ার; একে ছাড়িয়ে যাওয়ার, অতিক্রম করার, বদলে দেওয়ার। সেদিক থেকে লালনের রাজনীতিকে অধিরাজনীতি বলা যেতে পারে। কারণ, যে ধারণা-প্রপঞ্চ-কল্পমূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রাজনীতি আবর্তিত হয়, অধিরাজনীতি সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে এবং নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে, নিজের নতুন নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে।[১] আর এই রাজনীতি সমাজে যে বয়ান চালু থাকে, সেগুলোর অসংগতিগুলো প্রকাশ করে দেয়; আর এর মাধ্যমে বর্তমান (অনাকাঙ্ক্ষিত) পরিস্থিতির কাণ্ডজ্ঞানসর্বস্ব বুনট ভেঙেচুরে যায়। ফলে রাজনীতি কাণ্ডজ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।

প্রচলিত রাজনীতি অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে চর্চিত হয়। ফলে রাজনীতিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রথমেই বাইরে তাকান; কেননা রাজনীতি তার কাছে বহিরাঙ্গের বা এক্সটারনাল বিষয়। অন্যদিকে, লালনের রাজনীতি হলো প্রচলিত রাজনীতিকে উল্টে দেওয়ার রাজনীতি। অন্য সবকিছুর আগে

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি। নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার রাজনীতি। লালনের রাজনীতি প্রাথমিকভাবে ইন্টারনাল বা অন্তর্গত।

পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তা, তৎপরতা বা তত্ত্বায়ন শুরু হয় অপরকে নিয়ন্ত্রণ (সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বা অপরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ) করার অভিপ্রায় থেকে। অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই সব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান। আর এত সবের চাপে মানুষের 'স্ব-রূপ' হারিয়ে যায়। মানুষ নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলে। ঘোরাচ্ছন্ন জীবন-যাপন করে। লালনের রাজনীতি হলো 'অপর'-কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা। অপরকে নিয়ন্ত্রণের আগে নিজেকে (নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে) প্রস্তুত করা। নিজেকে সব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা। লালনের রাজনীতি হলো মানবসৃষ্ট কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করা। যে রাজনীতিতে মানুষ নিজে অগ্রাধিকার হারায়, যে রাজনীতিতে কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়ে ওঠে, লালন সেটাকে বদলে ফেলতে চান। সে জন্য লালনের রাজনীতি হলো মানুষকে অগ্রাধিকার দেবার রাজনীতি। নিজেকে আবিষ্কারের রাজনীতি। অন্যকে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই রাজনীতি, লালন স্বীকার করবেন বটে; কিন্তু এটাও বলবেন, সবার আগে চাই নিজের নিয়ন্ত্রণ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন নিজেকে জানা। আর লালনের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হলো সে নিয়ন্ত্রণ-আকাঙ্ক্ষী 'আমি'কে জানা ও নিয়ন্ত্রণ। একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলা দরকার। লালনের রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার কিংবা বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের বণ্টনকে কেন্দ্র করে নয়। তাঁর রাজনীতি হলো মানুষকে সত্যিকারভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর কেন্দ্রে স্থাপনের রাজনীতি। তাঁর প্রস্তাব মোতাবেক সেটা সম্ভব মানুষের চেতনায়নের মাধ্যমে। সেদিক থেকে লালনের রাজনীতি হলো চেতনায়নের রাজনীতি।

আমরা দেখি, লালন তাঁর কালামে বারবার প্রশ্ন করেছেন, যে বিষয়গুলোকে আমরা পবিত্র জ্ঞান করছি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে পর্যালোচনাহীনভাবে মেনে নিয়েছি, সেগুলো আদৌ আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক কি না? আমাদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত কি না? মজার বিষয়, তিনি নিজে সরাসরি কোনো প্রতিষ্ঠানকে খারিজ করার বা ধ্বংস করার কথা বলেননি। বরং তিনি, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায্যতা নিয়ে একধরনের পর্যালোচনা বজায় রাখার জন্য সতত সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল,

বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহের গণপর্যালোচনা যদি জারি থাকে, তাহলে যে ঐতিহাসিক ও মতাদর্শিক প্রেক্ষাপটে 'অন্যায্য' সমাজ তৈরি হয়েছে, তার ভিত্তিটি সবার কাছে পরিষ্কার হবে। ফলে অন্যায্য প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ যে সামাজিক বৈধতা পেয়ে আসছিল, সে বৈধতার পুনরুৎপাদন বন্ধ হবে। পুরোনো অন্যায্য ব্যবস্থা আর থাকবে না। পুরোনো সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের স্থলে কোন নতুন বন্দোবস্তের কথা লালন প্রস্তাব করেছেন? যা কিছু নতুন, তা কি পুরোনো থেকেই উৎসরিত হয় না? অতীত কি বর্তমানকে নির্ধারণ করে না? আর একইভাবে বর্তমানে গৃহীত পরিকল্পনা ও কৃত কাজই কি ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না? কেউ কি অতীতকে, অতীতের ক্ষমতাকাঠামো ও রীতি-নীতি-ঐতিহ্য-আচার-অনুষ্ঠানকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন—পারে না। আর একে তাঁরা পাথ ডিপেনডেন্স হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ফলে অতীত অন্যায্যতার কোনো না কোনো ধরনের প্রভাব বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে যে কাণ্ডজ্ঞান তৈরি হয়, তার ভিত্তিতেই সাধারণভাবে রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তাহলে উপায়? উপায় হলো, অতীত অভিজ্ঞতানির্ভর ও কাণ্ডজ্ঞানসর্বস্ব কর্মপরিকল্পনাকে উতরে যাওয়া, অতিক্রম করা। এ অতিক্রমণ সম্ভব হলেই অতীতের (ও বর্তমানের) অন্যায্যতার প্রভাব ভবিষ্যতে এড়ানো যাবে। লালনের ভাষায়, 'পূর্ব-কথা ছাড়ান দাও ভাই'।

বাস্তবতার নিরিখে অর্থাৎ যা কিছু বাস্তবে আছে তার নিরিখে আমাদের কী করা উচিত, সেই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারি না। সেটা যদি করতে যাই, তাহলে আমাদের শুধু নেতিতেই আটকে থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়। অর্থাৎ বর্তমানে যদি অসাম্য থাকে, তাহলে অসাম্য দূর করতে হবে, বর্তমানে যদি শোষণ থাকে, তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, শোষণ দূর করতে হবে। এখন অসাম্য-শোষণ ইত্যাদি দূর করাই যখন লক্ষ্য, তখন ইতিবাচক অর্জনটা উপলক্ষ হয়ে যায় মাত্র। আর সে জন্যই হয়তো আলথুসার মতাদর্শের নেতিবাচক খপ্পর থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য আরেক মতাদর্শের খপ্পরে ফেলে দেন। একই কারণে হয়তো আজকের বিপ্লবী আগামীর প্রতিক্রিয়াশীল হন। সে জন্যই নৈয়ায়িকেরা যা কিছু বর্তমানে আছে, তা থেকে কী করা উচিত—সে সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবে পৌঁছানো যায় বলে মত দেন না। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে অতীত ও বর্তমানের প্রভাবকে যতটা সম্ভব কমানো নৈতিকভাবে বাঞ্ছনীয়।

আমাদের কাণ্ডজ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে বাস্তব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপলাভ করে। ফলে সমাজের এবং মানব সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে ঐতিহাসিকতা থেকে মুক্তি দরকার। সে জন্য দরকার খোদ বর্তমানের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আর সেটাই অধিরাজনীতির লক্ষ্য। লালন আমাদের সে কথাই শুনিয়েছেন। তিনি বলেন :

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়
লালন বলে সে ভাব জানে
ওই ভাবের ভাবুক যারা।[২]

ভারতীয় পুরাণমতে, আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে ছিল সত্য যুগ, যখন সবাই সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন, সমাজে তখন সব বিষয়ে ন্যায্যতা ছিল। তারপর সে ন্যায্যতা কিছুটা ম্লান হয় এবং শুরু হয় ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগের পরে আসে দ্বাপর যুগ। এই যুগে সমাজে কেবল দুটি গুণ অবশিষ্ট থাকে : দয়া ও সত্যবাদিতা। সবশেষে কলি যুগ। যখন সবকিছুই ঘুণে ধরা, সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে বিকৃত। এমন হতাশাজনক অবস্থায় গৌর আবির্ভূত হলেন। তিনি এমন এক সৃষ্টিশীল যুগের সূচনা করলেন, যা অতীতের অন্য কোনো যুগের সঙ্গে, কোনো যুগের ভাব বা চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে মিলবে না। আর সৃষ্টিশীল ভাব বর্তমানের কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরই অধিরাজনীতি। এই অধিরাজনীতি আকাশকুসুম কল্পনা নয়। লালন বলেন, নদীয়াতে এর চর্চা হয়েছে :

বেদবিধি ত্যাজিয়ে দয়াময়
কী নতুন ভাব আনলেন নদীয়ায়।[৩]

লালন দাবি করছেন, নদীয়াতে এক নতুন ভাবের চর্চা শুরু হয়েছে। আর এটি সব দিক থেকে স্বকীয়। এযাবৎ যা কিছুরই চর্চা হয়েছে—যা কিছু শাস্ত্রে আছে, যা কিছু বিধিবিধানে আছে—তার সবকিছুকে ছাড়িয়ে নদীয়াতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এই চর্চা নিজে অধিরাজনৈতিক। আবার চর্চাবিষয়ক চিন্তাও সমানভাবে অধিরাজনৈতিক। কারণ, এই চিন্তা ও চর্চার মূলে রয়েছে প্রচলিত যুক্তি, মতাদর্শ ও অবকাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর। লালন সে লক্ষ্যেই সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য পথ বাতলে গেছেন।

লালনের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হলো ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। লালন জানেন, সে সমাজ নির্মাণ সহজ নয়। এর জন্য দরকার সামষ্টিক সাধনা।

ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিকভাবে আমরা মহাজনদের কাছ থেকে যেসব ব্যবস্থাপত্র পেয়েছি, সেগুলোর সব কটিই কালের আবর্তে হয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, নয়তো মানুষের ওপর চেপে বসেছে (এ মুহূর্তে উদাহরণ হিসেবে শুধু সমাজতন্ত্রের কথা বলা যায়। কারণ এর অনুসারীরা এখন দুর্বল; অন্যদের কথা বলা নিরাপদ নয়)। লালন সে জন্যই তাঁর আদর্শের কথা আমাদের সামনে হাজির করেছেন বটে, কিন্তু কোন পথে বা কোন কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করা যাবে, সে ব্যাপারে একেবারেই চুপ ছিলেন। তিনি চেয়েছেন, কলি যুগের অবতার মানুষই সে পথটা বেছে নেবে। আর সে জন্য তাঁকে সাহায্য করবেন গুরু।

লালনের গোটা কালামে গুরু ভিন্ন আর কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া দুষ্কর। এই গুরুর অধীনে মানুষ নিজেকে চিনবে, নিজেকে বিকশিত করবে। ব্যক্তির বিকাশ মানেই সমষ্টির বিকাশ। লালন মনে করতেন যে অন্য অনেক জীবের মধ্যে মানুষ একটি প্রজাতিমাত্র। প্রজাতি জীবন থেকে মানবজীবনে উত্তরণের লক্ষ্যে একজন গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও সাধনার ওপর লালন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। লালন ব্যক্তির বিকাশকে সমাজ বিকাশের জন্য যথেষ্ট বা সাফিশিয়ান্ট কন্ডিশন বলে মনে করতেন। তাই তিনি সমাজের সামষ্টিক পরিসরকে রূপ দিতে চান ব্যক্তির বিকাশের লক্ষ্যেই। সে জন্য সামষ্টিক পরিসরের নাম তিনি দেন 'সাধুর বাজার'। সাধুর বাজারের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের পাবলিক-স্ফিয়ার বা জনপরিসরের তুলনা করা যেতে পারে। জনপরিসর একটি আধাবাস্তব (কিংবা আধাকাল্পনিক) উপাদান হিসেবে ইউরোপের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের গণতন্ত্রায়ণের ভিতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে লালনের 'সাধুর বাজার' ধারণাটির অন্তর্গত মর্ম আমাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা জানি, ইউরোপের সমাজের ঐতিহাসিক বোঝাপড়াকে 'সামাজিক চুক্তি' হিসেবে তত্ত্বায়ন করা হয়েছে। বোঝাপড়া তো যেকোনো সমাজের একটি অনিবার্য বিষয়। সেই মোতাবেক, বঙ্গীয় সমাজের বোঝাপড়ার কিছু ঐতিহাসিক সূত্রের খোঁজ আমরা পেয়েছি লালনের কালামে। লালন আমাদের দুই ধরনের চুক্তির কথা বলেন। প্রথমটি হলো : ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তি। আর একে আমরা নৈতিক চুক্তি বলতে পারি। আর দ্বিতীয়টি হলো সমাজবদ্ধ মানুষদের পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া। আমাদের সমাজে এ বোঝাপড়াকেই ঐতিহাসিকভাবে 'পাপ-পুণ্যে'র মোড়কে হাজির করা হয়েছে বলে লালন আমাদের জানিয়েছেন। তবে পশ্চিমা সামাজিক চুক্তির ফলে

যেমন জবরদস্তিমূলক সংগঠন তৈরি হয়, আমাদের অঞ্চলের চুক্তিতে আনুষ্ঠানিক জবরদস্তির কোনো স্থান নেই।

সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী-পুরুষের সম্পর্কের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। অথচ আমরা জানি, সভ্যতার উষাকাল থেকেই প্রায় সব সমাজে নারীরা ছিলেন পিতৃতন্ত্রের শিকার, পুরুষের অধস্তন। নারীর ক্ষমতায়নের পশ্চিমা ব্যবস্থাপত্র নারীর অবস্থার ও অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন করতে পেরেছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সব প্রচেষ্টা পুরুষাচ্ছন্ন বা পুরুষকেন্দ্রিকই থেকে গেছে। এর বিপরীতে লালন সমাজবদ্ধ পুরুষকে অন্তর্গতভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে এক 'নারীতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হাজির করেন, যেখানে পুরুষের সাধনাই হবে নারী (প্রকৃতি) হওয়ার সাধনা। পুরুষ সেখানে 'কামী' ও আগ্রাসী নয়, পুরুষ সেখানে প্রেমিক ও দাস।

লালনের জীবনের লক্ষ্য হলো 'চরণদাসী' হওয়া। এ দাস্যভাব সমাজের প্রান্তিক মানুষকে অধিকতর প্রান্তিক বানানোর জন্য নয়, ক্ষমতায়িত করার দাওয়াই। প্রাচীন গ্রিস-এথেন্স, মধ্যযুগের আরব এমনকি উনিশ শতকের আমেরিকার দাসপ্রথা থেকে লালনের 'চরণদাসী'র ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল দাস হওয়ার মাধ্যমেই মানুষ তার নিজেকে জয় করতে পারে। আর নিজেকে জয় করতে পারার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি বাইরের জগৎকে জয়/নিয়ন্ত্রণ করার নৈতিক বৈধতা লাভ করে। লালনের বিবেচনায়, আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ রাজনীতির (অপরকে নিয়ন্ত্রণ অর্থে) পূর্বশর্ত।

'লালনের রাজনীতি' হিসেবে কোনো বিষয়কে আমরা যদি চিহ্নিত করতে চাই, তাহলে দুটি বিষয় প্রধান হয়ে ধরা দেবে। প্রথমত, লালন মানুষের কর্মকাণ্ডকে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোর অধীন করতে রাজি নন; বরং তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষকে যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়ত, 'অপর' হিসেবে প্রকৃতি ও অন্য মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের যে বাসনা থেকে মানুষ প্রচলিত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়, লালনের প্রকল্প সেটাকে গৌণ হিসেবে দেখতে চায়। কেননা, যিনি বা যাঁরা 'অপর'কে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া উচিত। সে জন্য লালন ব্যক্তির নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিতে চান। 'নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ' হলো লালনের প্রকল্পের সার। এই নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক চিন্তাপ্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। এই নিয়ন্ত্রণ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমাদের প্রচলিত রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লালনের কালামের আমাদের পাঠটুকু সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই বই লেখা। এখানকার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় সবার কাছে লালনের রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—সেটা উচ্চাভিলাষ মাত্র (আর লেখকমাত্রই এই রোগে আক্রান্ত)। ভবিষ্যতের গবেষকেরা এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে লালনকে সবার সামনে হাজির করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি। এখন আহমদ শরীফকে উদ্ধৃত করে লেখাটি শেষ করতে চাই। তিনি লেখেন, 'আমি নিজেও একসময় বাউল তত্ত্ব, বাউল গান ও লালন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। আজ মনে হয়, সে সব তথ্য ও তত্ত্বের সবটা যথার্থ নয়। আমার এখনকার ধারণা, বাউল মত বাঙলার ও বাঙালীর মৌলিক ধর্ম' [প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়—লেখক]।[৪] এতটুকু লিখলেই হয়তো চলত। তিনি তা করেননি। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম, ঐকান্তিকভাবেই বাঙালীর মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালীর জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতো তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্য বাঙালীকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলত'।[৫] আহমদ শরীফের এই মতকে আমরা ধারণ করি।

তথ্যসূত্র

১. Alain Badiou, *Metapolitics*, Trans. Jason Barker, New York: Verso, 2005.

২. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ১৩৮।

৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৪. আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ৬৯।

৫. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

গ্রন্থপঞ্জি

আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান*, ঢাকা : পারিজাত প্রকাশনী, ২০০৮।

আবদেল মাননান, *লালনদর্শন*, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৭।

আবদেল মাননান, অখণ্ড *লালনসঙ্গীত*, ঢাকা : রোদেলা, ২০১০।

আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯।

আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা : পলল, ২০১২।

আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০।

আহমাদ মাযহার ও পারভেজ হোসেন, *লালন ফকির : পাঠ ও বিবেচনা*, ঢাকা : সংবেদ, ২০১৬।

তসলিমা নাসরিন, *নারীর কোন দেশ নেই*, কলকাতা : ঋজু, ২০০৭।

বসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস, ছাপার সন ও তারিখবিহীন।

ফরহাদ মজহার, *সাঁইজীর দৈন্য গান*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

ফরহাদ মজহার, *বাংলার ভাবান্দোলন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

ফিরোজ এহতেশাম, *সাধুকথা : ১৩ বাউল-ফকিরের সাথে কথাবার্তা*, ঢাকা : মেঘ, ২০১৮।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৩৩।

রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, কলিকাতা : ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেস, ১৮৭৬।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, সম্পাদনা আবদুল কাদির, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬।

লীনা চাকী, *বাংলার বাউলানি*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নারীর মূল্য*, কলকাতা : বাকসাহিত্য, ১৩৬৪।

শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই : দেশ, কাল এবং শিল্প*, কলকাতা : সংবাদ, ১৯৯৫।

শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল : উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন*, কলকাতা : দে'জ, ২০১০ [১৯৯৯]।

সুধীর চক্রবর্তী, *গভীর নির্জন পথে*, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২/১৯৮৯।

সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, কলকাতা : প্রজ্ঞা, ১৯৯০।

সুধীর চক্রবর্তী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০১০।

সুধীর চক্রবর্তী, *বাউল ফকির কথা*, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২।

সুধীর চক্রবর্তী, *বিচিত্র লোকায়ত*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬।

Abu Ishahaq Hossain, *Lalon Shah: The Great Poet*, Dhaka: Palal Prokashani, 2009.

Adrian Leftwich, *What is Politics: The Activity and its Study*, Cambridge University Press, 2004.

Alain Badiou, *Metapolitics*, Trans. Jason Barker, New York: Verso, 2005.

Ananda Shankar Ray, Quoted in Muchkund Dubey, 'The Sadhana of Lalan Fakir', *Indian International Center Quarterly*, Vol. 24, No. 2/3, 1997, pp. 139-150.

Andre Padoux, The Tantric Guru, in David Gordon White edited. *Tantra in Practice*, Princeton: Princeton University Press, 2000.

Anirban Mondal, 'Searching for Moner Manush (Man of Heart): Bauls of Bengal and Fakir Lalon Shah', *Journal of Bengal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2015, pp. 58-65.

Arthur Avalon, *The Kularnavatantra*, Madras: Ganesh, 1965.

Atis Dasgupta, 'The Bauls and their Heretic Tradition', *Social Scientist*, Vol. 22, No. 5/6, 1994, pp. 70-83.

Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, New York: Routledge, 2013 [1946].

CA Bayly, The Pre-History of 'Colonialism'? Religious Conflict in India, 1770-1860. *Modern Asian Studies*, Vol. 19, No. 2, 1985, pp. 177-203.

Carol Salomon, 'The Cosmic Riddles of Lalan Fakir', in Arjun Appadurai, Frank J Korom and Margaret A Mills eds. *Gender, Genre and Power in South Asian Expressive Traditions*, New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.

Carola Lorea, 'Why did you go swimming in the river full of algae? - Conception and contraception in Bauls songs and oral teachings', *Folklore and Folkloristics*, Vol. 7, No. 1, 2014, pp. 9-45;

Charles H. Capwell, 'The Esoteric Belief of the Bauls of Bengal', *Journal of Asian Studies*, Vol. 33, No. 2, 1974, pp. 255-264.

Charles Taylor, *Modern Social Imaginaries*, Durham: Duke University Press, 2004.

Charles Capwell, 'The Popular Expression of Religious Syncretism: The Bauls of Bengal as Apostles of Brotherhood', *Popular Music*, Vol. 7, No. 2, The South Asia/West Crossover, 1988, pp. 123-132.

David Hardiman, *The Coming of the Devi, Adivasi Assertion in Western India*, Oxford University Press, Delhi, 1987.

E J Hobsbawm, *Nation and Nationalism Since 1780: program, myth, reality*, New York: Cambridge University Press, 2000.

Ed Diener & Robert Biswas-Diener, 'Psychological Empowerment and Subjective Well-Being', in Deepa Narayan eds. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*, Washington: The World Bank, 2005.

Emile Durkheim, *Elementary Aspects of Religious Life*, London, 1915.

Fabrizio M. Ferrari, 'Mystic Rites for Permanent Class Conflict: The Bauls of Bengal, Revolutionary Ideology and Post-Capitalism', *South Asia Research*, Vol. 32, No. 1, 2012, pp. 21-38.

Friedrich Engels, Quoted in Wilfried Nippel, Marx, Weber and Classical Slavery, *Classical Ireland*, Vol. 12, 2005.

Georg G. Iggers, 'Historiography in the Twentieth Century', *History and Theory*, Vol. 44, No. 3, 2005, pp. 469-476.

Georg Simmel, *The Sociology of Goerg Simmel*, eds. Kurt H Wolf, Illinois: The Free Press, 1950.

Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*, New York: Oxford University Press, 1986.

Gita Sen and Caren Grown, *Development, Crises, and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives*, New York: Monthly Review Press, 1987.

H H Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta: Secretariat Press, 1891, Quoted in Nicholas B Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*, New Jersey: Princeton University Press, 2011, pp. 211, 218.

Hannah Arendt, *On Violence*, New York: A Harvest/HBJ Book, 1970.

Hugh B Urban, *The Economics of Ecstasy: Tantra, Secrecy, and Power in Colonial Bengal*, New York: Oxford University Press, 2001.

Hugh B. Urban, The Marketplace and the Temple: Economic

Metaphors and Religious Meanings in the Folk Songs of Colonial Bengal, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 4, 2001, pp. 1085-1114.

Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Ehtics*, Rockville: Arc Manor, 2008.

Jacques Derrida, *Writing With Difference*, New York: Routledge, 1978.

James Peggs, *Slavery in India: The Present State of East India Slavery*, London, Third edition, 1938.

James Scott, *Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance*, New Jersey: Yale University Press, 2008.

Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, GDH Cole Trans., 1762.

Jeremy Bentham, *Fragment on Government*, Preface to First Edition.

Joel D Mlecko, The Guru in Hindu Tradition, *Numen*, Vol. 29, Fasc. 1, 1982, pp. 33-61.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999 [1971].

Juliet Mitchell, *Psychoanalysis and Feminism*, London: Allen Lane, 1974.

June McDaniel, 'The Embodiment of God Among the Bauls of Bengal', *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol. 8, No. 2, 1992, pp. 27-39.

Jurgen Habermas, 'Further Reflections on Public Sphere', in Craig Calhoun ed. *Habermas and The Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1996.

Jurgen Habermas, 'The Public Sphere: An Encyclopedia Article', *New German Critique*, No. 3, 1964, pp. 49-55.

Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge: MIT Press, 1991.

Kant, Immanuel, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*.

Karen Oppenheim Mason, 'Measuring Women's Empowerment: Learning from Cross-National Research' in Deepa Narayan eds. *Measuring Empowerment: Cross-National Perspective*, Washington: The World Bank, 2005.

Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, 1843.

Kate Millette, *Sexual Politics*, New York: Doubleday, 1969.

Keith Michael Baker, 'Defining the Public Sphere in Eighteenth-

Century France: Variations on a Theme by Habermas', in Craig Calhoun ed. *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1996.

Kevin Bales, *Understanding Global Slavery*, Berkeley: University of California Press, 2005.

Leigh Eric Schmidt, 'The Making of Modern "Mysticism"', *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 71, No. 2, 2003, pp. 273-302.

Lisa I. Knight, 'Bauls in Conversation: Cultivating Oppositional Ideology', *International Journal of Hindu Studies*, Vol. 14, No. 1, 2010, pp. 71-120.

Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*, Translated by G M Goshgarian, New York: Verson, 2014.

Marcus George Singer, 'The Ideal of a Rational Morality', *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Assoication*, Vol. 60, No. 1, 1986, pp. 417-443.

Meredith Anne Skura, 'Discourse and the Individual: The Case of Colonialism in "The Tempest"', *Shakespeare Quarterly* vol. 40, no. 1, 1989, pp. 42-69.

Michel Foucault, *Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault*, Amherst: University of Massachusetts Press 1988.

Michelle Barrett and McIntosh Mary, 'The 'family wage': some problems for socialists and feminists', *Capital & Class* Vol. 4 No. 2, 1980, pp. 51-72.

Muchkund Dubey, 'The Sadhana of Lalan Fakir', *India International Centre Quarterly*, Vol. 24, No. 2/3, 1997, pp. 139-150.

Naila Kabeer, 'Reflections on the Measurement of Women's Empowerment' in *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, Sida Studies No. 3, Stockholm: Novum Grafiska AB, 2001.

Nicole Pope, *Honor Killings in the Twenty-First Century*, New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Peter Goldberg and Jed Sekoff, 'Ideology and the Question of the Subject', *Canadian Journal of Political and Social Theory*, Vol. 4. No. 2, 1980, pp. 23-43.

Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial Bengal*, Delhi: Oxford University Press, 1983.

Raymond Williams, *The Long Revolution*, London: Broadview Press, 2001.

Robert K Merton, 'Manifest and Latent Function' in Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff & Indermohan Virk eds. *Classical Sociological Theory*, Wiley Blackwell, 2007.

Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, Oxford: Blackwell, 1999.

Sheila Rowbotham, 'The trouble with "patriarchy"', in *No Turning Back: writing from the women's liberation movement 1975-1980*. ed. Feminist Anthology Collective, London: Women's Press, 1981.

Sirajul Islam, Slavery, *Banglapedia*, <http://en.banglapedia.org/index.php?title=Slavery>, accessed on 8 March, 2018.

Srilatha Batliwala, 'The Meaning of Women's Empowerment: New Concepts in Action' in Gita Sen, A Germain and L C Chen (ed.) *Population Policies Reconsidered: health, Empowerment and Rights*, Cambridge: Harvard University Press, 1994.

Sudipta Sen, *Empire of Free Trade: The East India Company and The Making of Colonial Marketplace*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.

Sudipta Sen, Passages of Authority: Rulers, Traders, and Marketplaces in Bengal and Benaras, 1700-1750, *The Calcutta Historical Journal*, Vol. 17, No. 1, 1996, pp. 1-39.

Sumit Sarkar, *An Exploration of the Ramakrishna-Vivekananda Tradition*, Simla: Institute of Indian Studies, 1993.

Sushil Chaudhury, *From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal*, New Delhi: Manohaar, 1995.

Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Trina R Mamoon, 'Conversions/Subversions: Sufi Subtexts of Bangladeshi Identity', *Comparative Civilizations Review*, Vol. 59, No. 59, 2008, pp. 143-144.

Veronica Beechey, 'On Patriarchy', *Feminist Review*, No. 3, 1979, pp. 66-82.

Victoria Cuffel, 'The Classical Greek Concept of Slavery', *Journal of the History of Ideas*, Vol. 27, No. 3, 1966, pp. 323-342.

William Kingsland, *An Anthology of Mysticism and Mystical Philosophy*, London: Methuen & Co., 1927.

নির্ঘণ্ট

গ

চ

জ

ফ

ব

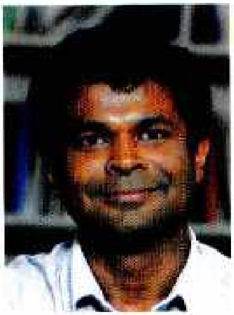
ভ

ম

য

য়

র



মামুন আল মোস্তফা

জন্ম ১৯৭৯ সালে, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার বাঁশগাড়ী গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ—*Idealized Islamic Past : Imams 'Authority in Bangladesh* (২০১৮)।

বাংলাদেশে লালন সাঁইয়ের পরিচয় মরমি সাধক হিসেবে। এই সাধনার যে গোপনতা, তার কোনো রাজনীতি বা সমাজতত্ত্ব আছে? সাধারণ মানুষের পক্ষে কি লালনের বাণীর মর্ম অনুধাবন সম্ভব? লালনের বাণী কি একেবারেই অরাজনৈতিক? আজকের বৈষম্য ও সংঘাতপ্রবণ পরিস্থিতিতে বৈষম্যহীন ও ন্যায্য সমাজ গড়ার ব্যাপারে লালনের রচনায় কি কোনো নির্দেশনা আছে এবং আজকের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় লালন কতটুকু প্রাসঙ্গিক?—এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

Prothoma
201901000017
TK. 320.00